ইদানীং

পরিমল রায়

এম, সি, সরকার অ্যাণ্ড সন্‌স লিঃ
১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

বুদ্ধদেব-কে

লেখাগুলি গত পাঁচ-ছয় বৎসরের মধ্যে নানা সাময়িক পত্রে স্বনামে ও ছদ্মনামে বাহির হইয়াছিল। রচনাস্থল ঢাকা, কলিকাতা ও দিল্লি। কালক্রম অনুসারে প্রথম রচনা 'রেকুইজিশন,' শেষ রচনা 'বহুবচন'। যুদ্ধের ধাক্কায় ঢাকা হইতে রাজধানীতে ছিট্‌কাইয়া পড়িয়াছিলাম, তাহারই ব্যক্তিগত ইতিহাস।

আশ্বিন, ১৩৫৬। **পরিমল রায়**

সূচীপত্র

ইদানীং

যে-বয়সটায় উপনীত হইয়াছি, তাহা প্রৌঢ়ত্বের আদি-পর্ব্ব। কোন্‌খান দিয়া যে এতগুলি বৎসর পার হইয়া গেল, ঠাহর পাইলাম না। এই না সেদিনও শার্টের আস্তিন গুটাইয়া কলার উল্টাইয়া সাইকেলে চক্কর মারিয়া বাসায় ফিরিলাম। ইহারই মধ্যে কখন-যে ঘাড়ের রোঁয়ায় পাক ধরিল, টেরই পাইলাম না।

সে-যুগের শিশুগণ এখন সকলে বড় হইয়াছে। তাহারা আমাদের দেখিলে গুরুজনবোধে সম্ভ্রম দেখায়, হাতের সিগারেটটি চকিতে পিছনে লুকায়। অনেকেরই বিবাহ হইয়াছে, তাহাদের বধূগণ আসিয়া আমাদের পদধূলি গ্রহণ করে। সেদিনকার ফ্রক-পরা মেয়েরা এখন নিজেদের কন্যার জন্য ফ্রক সেলাই করে। বুঝিতে পারি, আমরা ইদানীং বয়স্ক হইয়াছি। যৌবনে এই বয়সের কথা ভাবিয়া আতঙ্কে শিহরিত হইয়াছি। অথচ, মানুষের মনের কী অদ্ভুত গতিশীলতা, আজ প্রৌঢ়ত্বে পদার্পণ করিয়া মনে হইতেছে, এখন হইতেই জীবনের প্রকৃত আরম্ভ, নিজের স্বকীয়তা এবং শক্তির বিকাশ এই বয়স হইতেই সম্ভব,—এতকাল তো নিজেই নিজের কাছে অজ্ঞাত, অনাবিষ্কৃত ছিলাম। যুবা বয়সে

ভাবিতাম আমরা তরুণগণ বয়স্কগুলিকে পিছনে ফেলিয়া ভিড় ঠেলিয়া একেবারে ভিতরে আসিয়া বাজীকরের মুখোমুখি বসিয়াছি। এখন যাবতীয় বিশ্বরহস্যের মালিক আমরাই। প্রবীণগণ পিছন হইতে গলা উঁচাইয়া একটু আধটু দেখিলেও আসল দর্শক আমরা। উহাদের দিন ফুরাইয়াছে, তাই উহারা ক্রমশঃ ভিড়ের বাহিরে দূরে সরিয়া পড়িতেছে। এখন সকল খেলা, সকল মেলা আমাদের জন্য।

অথচ আসল কথাটি হইল, প্রতি বয়সেরই একটি স্বতন্ত্র দৃষ্টিকোণ আছে, এবং সেই দৃষ্টিপথে দূরবীক্ষণ-যন্ত্র লাগাইয়া নজর করিলে দেখা যায়, যতদূর পর্য্যন্ত চোখ চলে এই পৃথিবীর মিছিলের পুরোভাগে সর্ব্বদাই আমরা। যখন বালক ছিলাম, বড়দের অবান্তর বলিয়া মনে হইত, যখন তরুণ ছিলাম, প্রবীণদিগকে পৃথিবীর অসঙ্গতি বলিয়া জানিতাম, এখন প্রবীণত্বে উপনীত হইয়া স্পষ্ট বুঝিতেছি, এই বয়সের স্বমহিমা পশ্চাতের অপরিণত জীবনকে ম্লান করিয়া রাখিয়াছে। বার্দ্ধক্যে পৌঁছিলে নূতনতর দৃষ্টিকোণ উদ্‌ঘাটিত হইবে সন্দেহ নাই।

অর্থাৎ চুলে পাক ধরিয়া থাকিলেও আছি ভালো। তরুণগণ শুনিয়া বেদম হাসিবে, পাগলের যে গো-বধেই আনন্দ। তা' হাসুক। পাগলের তো আর নিরপেক্ষ কোন সংজ্ঞা নাই, উহা নিতান্তই একটা মতামতের ব্যাপার। এবং আমাদেরও একটা মতামত নিশ্চয়ই আছে।

বিশ্বাস করুন, বয়স্ক হইয়াও সত্য-সত্যই বেশ ভালো

আছি। যে-জীবনটা পিছনে ফেলিয়া আসিলাম, অনেক সময়ে তাহার দিকে ফিরিয়া তাকাই। কতকগুলি সোনালী মুহূর্ত্ত কাল-সমুদ্রের তরঙ্গ-চূড়ায় ঝিক্‌মিক্ করিয়া ওঠে বটে, কিন্তু সমগ্র বিচারে মনে হয়, এতকাল কেবল আসরে বসিয়া জীবন-যন্ত্রে সুর বাঁধিয়াছি, টুং টাং ঠুং ঠাং করিয়াই সময় কাটিয়াছে, আসলে কিছুই হয় নাই। অবশ্য এ-যন্ত্র বাজাইতে আসিয়া স্বর-গ্রামের আড়ালে একটা, অজ্ঞাত-না হোক, অন্ততঃ অখ্যাত-বাস সকলেরই প্রয়োজন। কিন্তু উহার প্রকৃত মূল্য সে-বয়সে ঠাহর হয় না। মনে হয়, এই যে মাথা ঝাঁকাইতেছি আর তার ছিঁড়িতেছি, জীবনের ইহাই চরম এবং পরম সংগ্রাম, কারণ ইহার পরই তো মৃত্যু।

আজ পরিণত বুদ্ধির তৌলে বিগত আয়ুর খণ্ড মুহূর্ত্তগুলির ওজন হইতেছে। তৎকালের কষ্টিপাথরে যাহা স্বর্ণরেখা বলিয়া বোধ হইয়াছে, আজ তাহা ফিকে দেখাইতেছে। হয়তো কষ্টিপাথরটিই বদলাইয়াছে, অথবা আঁচড়গুলি এখন নূতনভাবে পড়িতেছে। কী জানি, মনে হয়, আজ এতদিনে কবিতা পড়িতে শিখিয়াছি, মানুষকে শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছি, প্রেম কাহাকে বলে বুঝিয়াছি, সংযম ও শক্তি-সংহতির মূল্য উপলব্ধি হইয়াছে। হেলায়-ফেলায় সমস্ত হারাইয়া ছড়াইয়া আগে যে-উদ্দাম জীবন কাটিয়াছে, সে-বয়সে উহার মধ্যে একটা অকৃপণ অকুণ্ঠতার গৌরব বোধ করিয়াছি। এখন মনে হয়, উহা শক্তির মহতী বিনষ্টি, বিলকুল লোকসান।

মোট কথা, জীবনের এমন একটা পর্য্যায়ে পৌছিয়াছি,

যেখানে কোলাহল মিটিয়া গিয়াছে, চিত্তে প্রশান্তি আসিয়াছে, চক্ষুরাগ কাটিয়া গিয়া দৃষ্টি খুলিয়াছে, মনের রাজ্যে রাজা হইয়া বসিয়াছি।

একটি মাত্র উৎপাত, নাসাগ্রে মাছি বসিবার মত, এই মন্থর মানসিক পরিমণ্ডলে বিরক্তির সৃষ্টি করিয়াছে। সে-কথার উল্লেখ না করিলে আত্ম-প্রতারণা হইবে। অধুনা যেখানেই যাই, বিবাহ-যোগ্যা কন্যাদের পিতামাতাগণ বড় উৎপীড়ন করেন। পাত্রের সন্ধান আছে কিনা, সন্ধান থাকিলে ইতিপূর্ব্বে তাহা না জানাইবার কোনো সঙ্গত কারণ আছে কিনা, কন্যাটি যে আমারই আপন ভাগিনেয়ী, কিংবা শ্যালিকা, কিংবা ভ্রাতুষ্পুত্রী, এবং সে-কারণে ইহার বিবাহ যে অনেকাংশে আমারও দায়, সে-বিষয়ে আমি সম্যক্ অবহিত আছি কিনা, ইত্যাদি নানা প্রশ্নে পিতামাতাগণ বড় ঝালাপালা করিয়া তোলেন। অধ্যাপক হইয়া বিপদ আরো বাড়িয়াছে। আমার হাত দিয়াই তো কত ছেলে বাহির হইয়া যাইতেছে। উহারা উত্তর জীবনে কে কোথায় কত বেতনের কী চাকুরি করিতেছে, তাহা কি আমি জানি না? এবং কেনই বা জানি না?

এই উৎপাতটি ক্রমশঃ এত প্রবল হইতেছে যে, বিবাহ-যোগ্যা-কন্যা-সম্বলিত কোনো আত্মীয়গৃহে যাওয়াই এক মহা সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এতদিন এক ছোকরার কথা জানিতাম, জামশেদপুরে টিন্ প্লেট কোম্পানিতে আড়াইশো টাকা বেতনের চাকুরি করে। গত কয়েক বৎসর ইহার

কথাই সর্ব্বত্র চালাইয়া আসিয়াছি। ইদানীং শুনিতেছি, ছেলেটা বিবাহ করিয়া ফেলিয়াছে। অতঃপর সমস্যাটি আরো কতখানি ঘোরালো হইয়া পড়িল, বুঝিতে পারিতেছেন তো?

পূজার ছুটি

পূজার ছুটির আরো দুই তিন সপ্তাহ বাকী। পাড়ায় ইহারই মধ্যে সহকর্ম্মী বন্ধু মহলে ছুটিতে কে কোথায় যাইবেন, তাহার আলোচনা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। আমাদের অর্থাৎ অধ্যাপকদের কর্ম্ম-জগতে ছুটিটা একটু বেশি। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা দুই-ই অত্যন্ত কঠিন কাজ, ভয়ানক মাথার খাটুনি। সেজন্য বিশ্রামগুলিও লম্বা। একবার আরম্ভ হইলে—সখের থিয়েটারের বিরামের মত—আর শেষ হইবার নাম নাই। সারা বৎসর ধরিয়া ছুটির পারিতোষিকটা এত বেশি যে, বেতনটা পর্য্যন্ত লইতে কেমন লজ্জা বোধ হয়। এক শো টাকা হইলেই আমাদের যথেষ্ট, এবং সত্য বলিতে কি, অধ্যাপকদের বেতন হিসাবে উহাই একরকম কায়েমী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কাহারো দেড়শো টাকা বেতন শুনিলে আমাদের ঘৃণার অবধি থাকে না। ছি ছি ছি, বছরে এতগুলি ছুটির উপর আবার দেড়শোটি করিয়া টাকাও? ইহা প্রতারণা ছাড়া আর কী? এত অর্থ-গৃধ্নুই যদি হইবি, তবে এম, এ, পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইতে গিয়াছিলি কেন?

অবান্তর প্রসঙ্গে আসিয়া পড়িলাম, দেখিতেছি। হ্যাঁ, যে-কথা বলিতেছিলাম। পাড়ার অধ্যাপক-মহলে আসন্ন দীর্ঘ অবকাশ যাপনের প্রোগ্রাম আলোচনা আরম্ভ হইয়া

গিয়াছে। বিষয়টি এখন পর্য্যন্ত পরুষকণ্ঠে উচ্চারিত হয় নাই, তবে স্ত্রীমহলে ঘোরতর আন্দোলন সুরু হইয়া গিয়াছে। ইহার প্রধান নায়িকা মন্মথবাবুর স্ত্রী মীরা। ইনি স্বামিপুত্র সহ গিরিডি-তে পিত্রালয়ে যাইবার বাসনা করিয়াছেন। সুতরাং উৎসাহ সর্ব্বাপেক্ষা বেশি।

খবরটি প্রথমে স্ত্রী-র মারফত কানে আসিল। "জান্‌লে মীরাদি'রা গিরিডি যাচ্ছে—সবশুদ্ধ্।" কথাটির মধ্যে একটা লুব্ধ ব্যঞ্জনা লক্ষ্য করিলাম। অর্থাৎ, আমরা কোথায় যাইব, তাহার তো কোনো পরামর্শ দেখি না। বলিলাম,

"তাই নাকি ? খুব ভালো খবর বল্‌তে হবে। আর এঁরা ? মানে, তোমার শান্তিদি, রানী আর মুকুল ?"

"শান্তিদি-দের কথা এখনো শুনিনি। মুকুলরা বোধ হয় শিলং যাবে। রানীরাও যাবে কোথাও, শুনেছি। ওর ছেলেটা যা ভুগছে। ডাক্তার তো বলেছে চেঞ্জে যেতে।"

আমাদের ছেলেটি দুর্ভাগ্যক্রমে ভুগিতেছে না, এবং আমার স্ত্রীর দুঃখ ওখানেই। আলোচনা সেদিনকার মত শেষ হইয়া গেল। ও পক্ষ হইতে ইহার বেশি ইচ্ছাও ছিল না। কথাটা পাড়িয়া রাখামাত্র।

দিন সাতেকের মধ্যে নতুন খবর সংগৃহীত হইয়া আসিল। শান্তিদি'রা অর্থাৎ অমিয়বাবুরা যাইতেছেন বরিশাল, রানী-রা অর্থাৎ অমলেন্দু-রা কুচবিহার এবং মুকুল-রা অর্থাৎ পৃথ্বীশবাবুরা শিলং। মীরাদি-দের গিরিডি প্রোগ্রামও ঠিক আছে।

শুনিয়া বড় আনন্দ হইল। আমার নিজের সমস্যাটির এত সহজ সুরাহা হইবে ভাবিতে পারি নাই। গৃহিণী আশায় উন্মুখ হইয়া ছিলেন। বলিলাম, "আমরা কোথায় যাবো, জানো? আমরা যাবো—আমরা যাবো—আমবা কোথাও যাবো না।" একটা দেশলাই কাঠি যেন দপ্ করিয়া আলো হইয়া উঠিয়া ফস্ করিয়া নিবিয়া গেল। গৃহিণীর মুখ ঘোর অন্ধকার। দুই চারিদিন আগ্নেয়গিরি হইতে প্রচুর পরিমাণে ধূম নির্গত হইল, দুইচারি ঝলক লাভাও উৎক্ষিপ্ত হইল,—তারপর আস্তে আস্তে সব ঠাণ্ডা।

অথচ কথাটির তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলে এতখানি ধূম-জ্যোতি-সলিল-সন্নিপাতের দরকার হইত না। স্থান পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্য হইল, নিত্য-পরিচিত পরিবেশ হইতে কিছুকালের জন্য মুক্তি। সেই পরিচিত পরিবেশের সামগ্রী-গুলিই যদি স্থানান্তরিত হইয়া যায়, তাহা হইলে আমাদের আর অর্থব্যয় ও পথশ্রম সহ্য করিয়া অন্যত্র যাইবার কী কারণ থাকিতে পারে? পূরা দুইটি মাস ইঁহারা কেহ এখানে থাকিবেন না। মন্মথবাবুর রসিকতা, অমিয়বাবুর সূক্ষ্মতা, অমলেন্দুর অট্টহাসি এবং পৃথ্বীশবাবুর শ্রীঅরবিন্দ,—প্রত্যেকটি হইতে এক হাজার চারশো চল্লিশ ঘণ্টার নিষ্কৃতি। ভাবিলেও রোমাঞ্চ! বিনি পয়সায় এত বড় বিশ্রামের ভোজ, অথচ গৃহিণী তাহা বুঝিলেন না!

আপনারাও যেন আমাকে ভুল না বোঝেন। আমি বন্ধু-বিরাগী নই। ইঁহারা প্রত্যেকে আমার অতি অন্তরঙ্গ বন্ধু,

প্রত্যেকের সহিত বহুদিনের পরিচয়। ইহারা আছেন বলিয়াই এই দুর্দ্দিনেও 'হাসি-তামাসায় এবং আলাপ আলোচনায় দিন কাটাইতে পারিতেছি। কিন্তু মাঝে-মাঝে মনেরও হাওয়া বদল প্রয়োজন হয়। বিছানা রোদে দেওয়ার মত মনটাকে একটু বাহিরে হাওয়া খাওয়াইয়া না আনিলে পরস্পরের ঘনিষ্ঠ নিঃশ্বাসে এক-এক সময়ে হাঁপ ধরিয়া ওঠে। বন্ধুগণ সেই উদ্দেশ্যেই ইতস্ততঃ বাহির হইয়া পড়িতেছেন। আমার বাহিরে না গিয়াই পরিচিত পরিবেশের অবরোধ দূর হইতে চলিয়াছে। এ কথা স্বীকার করিবার মধ্যে কাহারো প্রতি অশ্রদ্ধার ইঙ্গিত নাই, কাহাকেও এড়াইবার চেষ্টা নাই। ঘরের কলি ফিরাইবার সময় জিনিসপত্র বাহিরে আনিয়া কিছুকালের জন্য দূরে সরিয়া দাঁড়ানো মাত্র।

সুবিধাটি আমার পক্ষে বিশেষ লোভনীয়। বাক্স বিছানা মাথায় করিয়া কোথাও যাওয়া আমার পছন্দ নয়। যাঁহারা ছুটির দিনে পিক্‌নিক্ করিতে যান, আমি তাঁহাদের দলের নই। মনের হাওয়া-বদল এক পা না নড়িয়াও হইতে পারে। সকলে পিক্‌নিকে চলিয়া গেলে সমস্ত বাড়ীময় আমি যে একা নিজেকে ছড়াইয়া বসিলাম, উহাই প্রকাণ্ড হাওয়া-বদল। এবং আমি উহারই বেশি পক্ষপাতী।

একা থাকিবার আনন্দ কিংবা প্রয়োজন আমরা অনেকেই বোধ করি না। আমরা রোগীকে কখনো একা থাকিতে দিই না। কাহারো অসুখ হইয়াছে শুনিলে তাহার বাড়ীতে গিয়া, বিছানায় বসিয়া, গা'য়ে হাত বুলাইয়া, পাঁচরকম

চিকিৎসা বাৎলাইয়া অসুখ বাড়াইয়া দিই। কেহ দুদিনের জন্য বাড়ীতে অতিথি হইলে তাহাকে দু'দণ্ড একা থাকিতে দেওয়ার প্রয়োজন আমাদের মনে আসে না। অষ্ট প্রহর তাহাকে ঘিরিয়া বসিয়া থাকিয়া অবাঞ্ছিত সৌজন্যে অতিষ্ঠ করিয়া তুলি। আমাদের দেশ নিতান্তই ভিড়ের দেশ, এখানে একা থাকা অসম্ভব। যদি-বা ভাগ্যক্রমে সে-সুযোগ দৈবাৎ উপস্থিত হইয়াছে, এখন কি স্ত্রীবুদ্ধির প্ররোচনায় উহা ছাড়িয়া অন্যত্র গিয়া ভিড় জমাইব?

শারীরিক কিংবা সাংসারিক প্রয়োজনে যে-সকল স্থান পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহা লইয়া আলোচনা অর্থহীন। আপনার যদি স্বাস্থ্যের পুনরুদ্ধারের জন্য মধুপুর যাইতে হয়, অথবা পুত্রবধূ নির্ব্বাচনের উদ্দেশ্যে মাদারীপুর যাওয়া দরকার হইয়া পড়ে, তাহা হইলে আপনি যাইবেন-ই। ভিন্ন পরামর্শ কেহ দিবে-ও না, আপনি-ও শুনিবেন না। 'অপ্রয়োজন'-এর স্থান পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে কিন্তু আলোচনা চলিতে পারে। এ ক্ষেত্রে লোকে রুচি অনুসারে স্থান নির্ব্বাচন করিয়া থাকেন, এবং বিশ্রামের ব্যবস্থাও নানা রকমের হইতে দেখা যায়।

অনেকে বিশ্রাম বলিতে পরিশ্রম বোঝেন। তাঁহারা ছুটির সুযোগ হইলে শ্বশুরালয়ে কিংবা কোনো গুরুজন-বিরল বন্ধুগৃহে গিয়া ভিড় জমান। পূরা দমে আড্ডা দিয়া, তাস খেলিয়া, পিক্‌নিক করিয়া, সিনেমা দেখিয়া, অর্থাৎ মাস দুই মহা হৈ-চৈ করিয়া অবশেষে পরিশ্রান্ত

দেহে কর্ম্মস্থলে ফিরিয়া আসেন। যে দুই তিন খানি পুস্তক সঙ্গে লইয়া যান, তাহা খুলিবারও অবসর হয় না। নিজেকে ভুলিবার জন্যই যেন একটা অবিরাম কোলাহলের মধ্যে নিজের স্বকীয়তা সম্পূর্ণ লুপ্ত করিয়া দিয়া গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসাইয়া দেন। এ ধরণের অবসর-বিনোদন স্ত্রীলোক হইলে ক্ষমার যোগ্য। স্ত্রীলোকের ব্যক্তিত্ব-বোধ প্রবল নহে। প্রত্যেকে একটি প্রকাণ্ড, কোলাহল-মুখর জনতা-পিণ্ডের অংশ মাত্র। বিচ্ছিন্ন ভাবে কাহারো বিশেষ অস্তিত্ব নাই। পুরুষের পক্ষে এরূপ অবসর-যাপন নেশায় বুঁদ হইয়া থাকিবার মত। অথচ পুরুষের প্রকৃতি স্ত্রীলোকের হইতে ভিন্ন। সুতরাং ইহা এক প্রকার অ-প্রকৃতিস্থ অবস্থা।

অনেকে ইহাদের বিপরীত। তাঁহারা অবসর সময়ে নিজেকে ভুলিতে চান না, বরং নিজেকে ফিরিয়া পাইতে চান। অবসর যাপনের ব্যবস্থাও তাঁহাদের অন্য রকমের হইতে দেখা যায়। যাঁহারা ধনী, তাঁহারা অর্থবলে কোথাও একটি নিভৃতবাসের আয়োজন করেন, যেখানে ছুটি উপলক্ষ্যে লোক-সমাগম সাধারণতঃ হয় না,—সাঁওতাল পরগণার কোনো নিভৃত জনপদ, পূর্ব্ববঙ্গের পদ্মাবিধৌত কোনো নির্জ্জন পল্লী। যাঁহাদের সে-শক্তি নাই, তাঁহাদের আমার মত অপেক্ষায় থাকিতে হয়। অন্যেরা স্থান ত্যাগ করিয়া গেলে নিভৃত বাসের ব্যবস্থা আপনা হইতেই হইয়া যায়। দু'য়ের মধ্যে অভীষ্ট-সিদ্ধির কোনো পার্থক্য নাই। যেটুকু প্রভেদ তাহা আর্থিক। বড়লোক কাহারো অপেক্ষায় থাকে না।

নিজেকে লইয়া অবসর-ভুঞ্জনের মত উৎকৃষ্ট জিনিস আর নাই। জনতা হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া মাত্র নিজের সে এক অনির্ব্বচনীয় রূপ। বুদ্ধির সঙ্গে বুদ্ধির সংঘর্ষ, যুক্তির সঙ্গে যুক্তির অনৈক্য, রুচির সঙ্গে রুচির বৈষম্য, ইত্যাদি সামাজিক পরিবেশের যে-কয়টি বিপত্তি লইয়া আমাদের দৈনন্দিন জীবন, তাহাদের সম্পূর্ণ অবসান ঘটাইয়া একাকীত্বের এক মনোহর প্রশান্তি। যেন চাবি-টিপিবামাত্র এক নূতন রাজ্যের সিংহদ্বার উদ্‌ঘাটিত হইয়া গেল। সেখানে নিজেরই ভাবনায়-চিন্তায়, বুদ্ধি ও বিচারে গঠিত এবং পুষ্ট অসংখ্য অনুগত প্রজার নিত্য অনুরঞ্জন। মাঝে-মাঝে নিজেকে কাছে পাওয়া তাই এক মহা সৌভাগ্য। দ্বন্দ্ব নাই, তর্ক নাই, ব্যঙ্গ নাই, বিদ্রূপ নাই—কোথা হইতে বিশ্ব জুড়িয়া এক বিরাট স্বাচ্ছন্দ্যের স্নিগ্ধ জলস্রোত প্রবাহিত হইয়া আসিল। অবগাহন করিয়া কী অপরিসীম তৃপ্তি!

সেই প্রবাহের অগ্রগামী বায়ুহিল্লোল আমাকে যেন আজই স্পর্শ করিতেছে।

বন্ধুগণ কবে স্থানান্তরে যাইবেন?

যুদ্ধ

সংসারের হিসাব-পত্র লইয়া মহা ব্যস্ত হইয়া আছি। এ মাসটা চলিবে কী করিয়া ভাবিয়া কূল পাইতেছি না। প্রতি মাসের গোড়াতেই এই দুর্ভাবনা। এ যাবৎ চলিয়া যে আসিয়াছে, তাহার একমাত্র কারণ, গত মাস পর্য্যন্ত মৃত্যুর বিলম্ব ছিল। কিন্তু এবার বোধ হয় ঘনাইয়াই আসিয়াছে, নহিলে দু'শো টাকা আয়ের সংসারে তিনশো সাতাত্তর টাকার বাজেট হইবে কেন? চক্ষু দু'টি কপালে উঠিয়াছে। উহাদের স্থান-পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া গৃহিণী যথাসম্ভব গা-ঢাকা দিয়া ফিরিতেছেন। সহসা সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইতে ভরসা পাইতেছেন না।

ইন্সুওরেন্স প্রিমিয়মটাকে ওমাসে চালান করিয়া দিবার মতলব আঁটিতেছি, এমন সময় খোকন আসিয়া হাজির। জীবন-মৃত্যুর এমন সন্ধিক্ষণে একমাত্র খোকনেরই আমার নিকট আগমন সম্ভব। তাহার ভয় ডর নাই। ঘরে ঢুকিয়া এটা সেটা নাড়িয়া চাড়িয়া হঠাৎ অত্যন্ত নির্লিপ্তভাবে প্রশ্ন করিল, "বাবা তুমি বাঘ মারতে পারো?" পুত্র লইয়া আহ্লাদ করিবার মত মানসিক অবস্থায় ছিলাম না। অন্যমনস্কভাবে বলিলাম, "হুঁ"।

"ভালুক মারতে পারো?"

"হুঁ।"

"সিংহ মারতে পারো ?"

"হুঁ ।"

"হাতী ?"

"হুঁ ।"

"সবগুলি পারো ?"

"হুঁ ।"

শুনিয়া খোকন প্রথমে বিস্ময় মানিল। পরে পিতার এই অসঙ্গত নির্ভীকতায় মহা বিরক্ত হইয়া ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল। বোধ হয় আশা করিয়াছিল, কোনো-কোনো জন্তু সম্পর্কে পিতার দুঃসাহসের একটা সীমা লক্ষিত হইবে, এবং তাহা হইলে উহা লইয়া একটা আলোচনা চলিতে পারিবে।

অথচ আমার দিক হইতে বাস্তবিক কোনো সত্যের অপলাপ ছিল না। সংসার-সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়া অবধি ভাঙা ঢাল এবং ভোঁতা তলোয়ার সহযোগে যে প্রচণ্ড যুদ্ধটা চালাইয়া আসিতেছি, সম্মুখে আসে কাহার সাধ্য ? বাঘ-সিংহ ছারখার হইয়া যাইবে না ?

প্রিমিয়মটা পরের মাসে আংশিক চালান হইয়া গেল। দুইটা পলিসির প্রিমিয়ম এক মাসে পড়িয়া বেতনটার উপর আটাত্তর টাকা চোদ্দ আনার এক বিষম কামড় বসাইয়াছিল। একান্ন টাকা ছ' আনাটা এ মাসে রাখিয়া সাড়ে সাতাশ টাকাটা ওমাসে চালান করিয়া দিলাম। ও মাসে প্রিমিয়মের ফাঁক আছে, সুতরাং বুদ্ধিটা মন্দ হইল না। তিনশো সাতাত্তর সাড়ে তিনশো-তে আসিল। আয়ের উপর তবু

দেড়শোটি টাকা বেশি। আর কী কমানো যায়? খরচগুলি পরীক্ষা করিতে বসিলাম। বাড়ী ভাড়া? বাড়ী ভাড়া বাদ দেওয়া অসম্ভব। দুধের বিল? আরে সর্বনাশ! সঙ্গে সঙ্গেই দুধ বন্ধ করিয়া দিবে। চাকর? না। ঝি? নৈব। মুদি? নৈব চ। ডাক্তারখানা? হ্যাঁ, এইবার ঠিক হইয়াছে —ডাক্তারখানা। এ মাসে কিছু না দিলে কী আর এমন হইবে? আগামী মাসে না-হয় বেশি করিয়া দেওয়া যাইবে। কমিলো আরো দশ। হইল একশো চল্লিশ। আর কী কমানো যাইতে পারে? বহু চিন্তা করিলাম, কল্পনায় পাওনাদারদের বহু যুক্তি-তর্ক, এমন কি, অনুনয়-বিনয় করিয়া ঠেকাইতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু কোনো ফল হইল না। আর কিছুই কমানো যায় না। আসল কথা, যে দু'তিনটি পর্বত-প্রমাণ খরচ অতর্কিতে আসিয়া পড়াতে (ঘরের কথা একেবারে খুলিয়া না-ই বলিলাম), বাজেটের এই পানি-না-পাওয়া হাল হইয়াছে, তাহার হেরফের অসম্ভব। মাসিক বরাদ্দ খরচও তাই। ফলে—

মোদ্দা, একশো চল্লিশটি টাকা আরো চাই। আরো চাই, কিন্তু কোথা পাই? ধার করিব? মন্দ কি? ধার কে না করে? ধার-বাকী সবারই কিছু-কিছু হবারই। (বাঃ, পদ্যটা মিলিল তো বেশ!) কিন্তু পদ্য মিলিল বটে, ধার মিলিবে কোথায়? সুতরাং, ধার করা হইবে—না, কারণ, ধার কেহ দিবে—না। তাকিয়ায় এলাইয়া পড়িয়া একটা প্রচণ্ড দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া ডাকিয়া উঠিলাম, ভগবান!

ভগবান বারাণ্ডা ঝাঁট দিতেছিল। ডাক শুনিয়া আসিয়া উপস্থিত। ব্যাটাকে দেখিয়া পিত্ত জ্বলিয়া গেল। হাঁকিয়া বলিলাম, 'যা ব্যাটা, তামাক নিয়ে আয়।'

ইতিমধ্যে খোকন পুনরায় ঘরে প্রবেশ করিয়াছে। এক-খানি কাগজ গোল করিয়া পাকাইয়া মুখে লাগাইয়া অনবরত 'হ্ব্-উ-উ' 'হ্ব্-উ-উ' শব্দ করিতে করিতে আমার দিকে অগ্রসর হইতেছে। নাঃ বিরক্তির একশেষ করিয়া ছাড়িল! ধমকাইয়া উঠিলাম।

"ও কী হচ্ছে, খোকন?"

"স্টীমারে করে চিঠি আস্‌চে। হ্ব্-উ-উ"

হতভাগা ছেলে কোথাকার। অথৈ জলে পড়িয়াছি দেখিয়া স্টীমার ভাসাইয়া আসা হইতেছে। ধরিয়া আনিয়া দু ঘা লাগাইয়া দিবার উপক্রম করিতে খোকন মুখের কাগজ-খানি আমার উদ্দেশ্যে ছুঁড়িয়া দিয়া পলায়ন করিল। দেখিলাম, একখানি রেজিস্টারী চিঠি, এইমাত্র ডাকে আসিয়াছে। রসিদ লিখিয়া দিয়া খাম খুলিতে চক্ষু স্থির! কলিকালে এমন ভেল্কিও সম্ভব! আপনারা শুনিয়া কিছুতেই বিশ্বাস করিবেন না, চিঠিতে একখানি একশো কুড়ি টাকার চেক। এক চা-কোম্পানির শেয়ারের ডিভিডেণ্ড। কবে পৈতৃক টাকায় কিছু শেয়ার কিনিয়া রাখিয়াছিলাম মনেও ছিল না। ইদানীং যুদ্ধের বাজারে চা-বাগানগুলির অবস্থা ভালো হইতেছে গুজব শুনিয়াছিলাম বটে, কিন্তু আমার ভাগ্যে-যে কোনোদিন কিছু অর্থলাভ সম্ভব, স্বপ্নেও ভাবি

নাই। সুতরাং যাহা ঘটিল তাহাকে অলৌকিক ছাড়া আর কী বলিব? কিছুক্ষণ বিমূঢ়বৎ বসিয়া রহিলাম। হাসিব, না কাঁদিব, বুঝিতে না পারিয়া কেমন একটা হতবাক্ হতবুদ্ধির অবস্থা। তারপর আস্তে আস্তে সম্বিৎ ফিরিয়া আসিতে লাগিল। চেতনা-সঞ্চার হইতে বুঝিলাম, মৃত্যুর এখনও বিলম্ব আছে, এ মাসটিও উৎরাইয়া গেল। মনের আবেগে গৃহিণীকে ডাকিয়া পাঠাইলাম। তাহার পর যাহা ঘটিল, সে একটি হাসি-কান্নাময় দাম্পত্য নাটিকা। উপসংহারে বলিতেছিলাম, "দেখ্‌লে তো, অচল সংসার চলে কী ক'রে? তোমার তো কেবল ওই এক কথা, যুদ্ধের জন্যেই যত খরচান্ত। যুদ্ধ আর যুদ্ধ আর যুদ্ধ। আরে যুদ্ধ ব'লেই না আজ এই টাকাটা পেলে। ওরা চা খাচ্চে আর যুদ্ধ করছে, চা খাচ্চে আর যুদ্ধ করছে। বেঁচে থাক্, বাবা, যুদ্ধ। বাজেট, বুঝলে কিনা, একেবারে যাকে বলে ব্যা—"

কী জানি কেন—বোধ হয় দৈব নির্দেশেই—কথাটা সম্পূর্ণ হইতে পারিল না। হঠাৎ গাড়ি থামিয়া যাইবার মত একটা প্রবল ঝাঁকুনি খাইয়া অজাধ্বনিতে অর্দ্ধ-সমাপ্ত হইয়া রহিল। বাড়ীর ভিতর দিককার বারাণ্ডায় কী যেন একটা ঘটিয়াছে। সাইকেলটা ঝন্‌ঝন্ শব্দে পড়িয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে খোকন ও মীনুর একটা বীভৎস আর্ত্তনাদ এবং পরক্ষণেই সমস্ত স্তব্ধ। ছুটিয়া গিয়া যাহা দেখিলাম তাহাতে মুণ্ড ঘুরিয়া গেল। দুই ভাই-বোনে বারাণ্ডায় উপুড় হইয়া পড়িয়া আছে, দু'জনের নাক মুখ হইতে রক্ত ঝরিতেছে। সাইকেলটা দুই-

জনকে চাপা দিয়া সম্মুখের চাকা উঁচাইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। কী হইয়াছে, কেন হইয়াছে ভাবিবার সময় ছিল না। ধরিয়া উঠাইতে দু'জনের চোখ-মুখের অবস্থা দেখিয়া মনে হইল, বুঝি বা ডালকুত্তা দিয়া উহাদের কেহ খাওয়াইয়াছে। গৃহিণী কাঁদিয়া আকুল। প্রতিবেশীগণ ছুটিয়া আসিলেন, বাড়ী লোকে লোকারণ্য।

দুই তিন সপ্তাহ কোনখান দিয়া চলিয়া গেল খেয়াল নাই। ডাক্তারে-ইঞ্জেকশনে-ওষুধে-প্লাস্টারে-পুলটিশে-ট্যাক্সি-ভাড়ায়-গাড়ি-ভাড়ায় পনেরো-বিশ দিনে একশো টাকার উপর বাহির হইয়া গেল।

দুর্ঘটনার ইতিহাসটা পরে উদ্ধার করা গিয়াছিল। উহারা বার্লিনে বোমা ফেলিতে যাইতেছিল। খোকনকে পাইলট সাজাইয়া স্কন্ধে চড়াইয়া মীনু চিলে কোঠা হইতে সিঁড়ি বাহিয়া নীচে ডাইভ-বমিং করিতে যাইবে, এমন সময় মীনুর পা হড়কাইতে দু'জনে শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হইয়া প্রচণ্ড বেগে বারাণ্ডায় মুখ থুবড়াইয়া পড়িয়াছিল। অতঃপর কী ঘটিয়াছিল তাহারা বলিতে পারে না।

আত্মীয়

আমার কলিকাতার বন্ধুগণ আমার একটি দুর্ব্বলতা লইয়া মাঝে-মাঝে খুব পরিহাস করেন। সে হইল আমার আত্মীয়-প্রীতি। তাঁহারা বলেন, যাঁহাদের সহিত আত্মার সংযোগ একেবারেই নাই, তাঁহারাই আত্মীয়। অথচ উঁহাদেরই লইয়া আমার উৎসাহের আর সীমা নাই। কলিকাতায় গেলাম তো শিবপুরে পিসিমার বাড়ী, দমদমায় ছোটমামার বাড়ী, চড়কডাঙায় চণ্ডীকাকার বাড়ী, পানিহাটিতে বলাইদাদার বাড়ী,—দিন সাতেক সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত কলিকাতার কণ্ঠ-উপকণ্ঠের শিরা-উপশিরা বিদীর্ণ করিয়া অবশেষে এক-দিন ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে ঢাকা মেইলে স্বস্থানে ফিরিয়া যাই। বন্ধুরা বলেন, ইহা পাগলামি ছাড়া আর কী?

আমি আশা করি, উঁহারা যতটা বলেন, ততটা কিছু নয়। কলিকাতায় গেলে যতগুলি সন্ধ্যা বন্ধুদের আড্ডায় কাটানো যাইতে পারে, তাহার কিছু-কিছু অন্যত্র অপব্যয় হয় বলিয়াই অনেকটা অভিমানবশত তাঁহারা এই সকৌতুক অভিযোগ করিয়া থাকেন। আসল কথাটি হইল, আত্মীয়তার নামে যে আত্মনিগ্রহ আমাদের সমাজে প্রচলিত, তাহারই বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ঘোষণা করা। এবং সে-বিষয়ে আমি বন্ধুদের সহিত সম্পূর্ণ একমত।

আত্মীয় ও স্বজনের মধ্যে প্রথমত একটা প্রভেদ করিয়া লওয়া উচিত। স্বজন নিতান্তই আপনার জন। তাহার

সহিত মনের দিক হইতে কোনো ব্যবধান নাই, আচার-ব্যবহারেও বিধি-নিষেধের বালাই নাই। সম্বন্ধের নৈকট্যটি অবশ্যই রক্ত-নিরপেক্ষ। যে-অন্তরঙ্গতাটি গড়িয়া ওঠে, তাহা সম্পূর্ণ পরিবেশনির্ভর। ব্যাপক অর্থে অন্তরঙ্গ প্রতিবেশীও স্বজন। অপর পক্ষে, পরিজনবর্গের মধ্যে যাঁহারা মনের দিক হইতে দূরে, তাঁহারা আত্মীয়। ইঁহাদের সহিত স্বজনসুলভ অন্তরঙ্গতা প্রদর্শন সামাজিক কর্তব্য, নহিলে লোকে মনে করিবে কী? অথচ মন অতখানি অগ্রসর হইতে প্রস্তুত নহে। এই অন্তর্বিরোধই আত্মীয়তার মৌল পদার্থ।

স্বজনকে লইয়া আমাদের কোনো সমস্যা নাই। সমস্যা সৃষ্টি করেন আত্মীয়গণ। ইঁহাদের সহিত সারা বৎসরের মধ্যে কোনো যোগাযোগ থাকে না, রাস্তায় দেখা হইলে কুশল-জিজ্ঞাসার অধিক বাক্য-বিনিময় হয় না, পত্র-বিনিময় তো নাই-ই। অথচ বিবাহাদি লৌকিক অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত হইতে হয় এবং নিমন্ত্রণ করিতে হয়। নিমন্ত্রিত হওয়ার অর্থ, কতক-গুলি টাকা খরচ করিয়া উপহারদ্রব্য কিনিয়া দেওয়া এবং অসময়ে দুষ্পাচ্য আহার্য্য ভক্ষণ করিয়া আসিয়া জোয়ানের আরকের সাহায্যে অম্লোদ্গার নিবারণ করিতে করিতে অনিদ্রায় রাত্রি যাপন করা। নিমন্ত্রণ করিবার ফ্যাসাদও কম নয়। ডাকে চলিবে না, বাড়ীতে গিয়া আহ্বান করিতে হইবে। যাঁহারা নিমন্ত্রণে আসিলেন, তাঁহারা অধিকাংশ-ই অপরিচিত। “এই যে, আসুন” বলিয়া তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন, “আরেকটি সন্দেশ?” বলিয়া আপ্যায়ন করিলেন,

"নমস্কার" বলিয়া বিদায় দিলেন। যোগাযোগ অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য আবার বিচ্ছিন্ন হইল।

যাঁহাদের কথা বলিলাম, তাঁহারা অবশ্য মনের দিক হইতে একেবারে বিদেশী। আত্মীয়-মহলের অপর একটি অংশ আছে। সেখানে যোগাযোগ অতখানি বিরল নহে। দেখা-শুনা মাঝে মাঝে হইতেছে, যাতায়াত চলিতেছে, খোঁজ-খবরও মোটামুটি নিয়মিত। আত্মীয়-সমস্যার উৎপত্তি প্রধানত এখানেই।

প্রথম সমস্যা হইল, আত্মীয়বৃন্দের অভিমান? "কলি-কাতায় আসিল, অথচ একটিবার দেখা করিয়া গেল না।" অভিমানীটি হয়তো কালিকাতীয় এলাকার বাহিরে যাদবপুর কিংবা বৈদ্যবাটিতে অধিষ্ঠান করিতেছেন। কিন্তু সে-কথা শুনিবে কে? আপনি যদি কলিকাতা পর্য্যন্তই আসিতে পারিলেন, তাহা হইলে আর দু' কদম পা বাড়াইয়া যাদবপুর যাইতে বাধা কী ছিল? আসলে, উহাদের প্রতি আপনারই কোনো আকর্ষণ নাই, নহিলে—ইত্যাদি। সম্পর্ক যত শিথিল, অভিমান তত বেশি। মানসিক দূরত্ব যত বেশি, অনুযোগ-অভিযোগের দৌরাত্ম্য তত প্রবল। আপনার গতিবিধি সম্বন্ধে ইঁহারা আসলে সম্পূর্ণ উদাসীন। কিন্তু ঐ যে খবরটুকু পাওয়া গেল আপনি কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, উহাতে অভিমান করিয়া আত্মীয়তা ফলাইবার বড় সুবিধা হইয়া গেল। আপনি বুঝিলেন, উঁহারা আপনার প্রতি অতি স্নেহশীল, এবং আপনাকে একবারটি দেখিবার জন্য

সর্বদাই উন্মুখ। আপনি নিজেই অতিশয় বর্বর, অসামাজিক এবং স্বজন-বিমুখ, তাই এই সকল স্বজাতীয় স্নেহ-সরোবরগুলি এড়াইয়া ইয়ার-বন্ধু সমাজের বিদেশী জলের কলে গাত্র মার্জনা করিয়া ফিরিতেছেন।

দেখা করিতে গিয়াও সমস্যার অন্ত নাই। কাল আবার আসিয়া এখানে চাট্টি ডাল-ভাত খাইতে হইবে। আজ অবশ্য চা ও সন্দেশ খাওয়ানো হইল। কিন্তু কালও আসিতে হইবে। প্রস্তাব শুনিবামাত্র আপনি অনায়াসে বলিতে পারিতেন, "তাহার আর আবশ্যক কী? মনে রাখিবার মত কিছু করিতে চান তো? সে তো হইল-ই। চায়ের নামে যে তরল বীভৎসতা এইমাত্র গলাধঃকরণ করিতে হইল, তাহা নিতান্তই চিরস্মরণীয়।" কিন্তু ইহা তো আর সত্যি-সত্যি বলা চলে না। বড় জোর চায়ের প্রতি বৈরাগ্য দেখাইয়া দু'এক চুমুক খাইয়া সরাইয়া রাখিতে পারেন। নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করা অসম্ভব হইলে পরদিন পুনরায় উপস্থিত হইবেন, এবং খাইতে বসিয়া বুঝিবেন, আপনি ঢাকায় ফিরিবার পথে আপনার সঙ্গে এ বাড়ীর পিসিমারও যাইবার বন্দোবস্ত স্থির হইয়া গিয়াছে। পিসিমার দেবরকন্যাটিও সঙ্গে গেলে আপনার হয়তো কিছুটা উৎসাহ হইত। কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রেই পিসিমা জনসংখ্যা বাড়াইয়া আপনার কষ্টের কারণ না-হইতে বদ্ধপরিকর।

এ ধরণের উৎপাত হইতে বাঁচিতে হইলে আমার বন্ধু পঙ্কজকুমার দাশগুপ্তর পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে হয়। তিনি

আত্মীয়গৃহে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া নির্দিষ্ট তারিখে বাড়ীতেই আহারাদি করেন। যাতায়াতের টাইম-টেবল তো রীতিমত 'মিলিটারী সিক্রেট'। তিনি কবে কোন্ ট্রেনে কোথায় যাইতেছেন, পূর্বে বুঝিবার উপায় নাই। এমন কি, বিশেষ বেগতিক দেখিলে আত্মীয়দের শত্রুপক্ষ কল্পনা করিয়া ফাঁকি দিতেও কোনো রকম নৈতিক মনোবৈকল্যবোধ নাই। ঢাকায় ফিরিবার দিন হয়তো আগামী কল্য সোমবার। রবিবার জিজ্ঞাসিত হইয়া তিনি অবলীলাক্রমে জানাইলেন বৃহস্পতিবার রওনা হইবেন। পিসিমা বৃহস্পতিবার যথাসময়ে শিয়ালদহ স্টেশনে আসিয়া হাহাকার করিতে লাগিলেন।

আত্মীয়-মহলের আরেকটি সঙ্কট অপেক্ষাকৃত মৌলিক। একটি একান্নবর্তী পরিবার দুই তিন পুরুষে ক্রমে ক্রমে যখন বিভক্ত হইয়া পড়ে, তখন ইহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধের কথা ভাবুন।

ভ্রাতাগণ ভিন্ন ভিন্ন সংসার ফাঁদিয়াছেন। ভগ্নীদের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেকের পরিবার পুত্র কন্যা পৌত্র দৌহিত্র ইত্যাদিতে ক্রমবর্ধিষ্ণু। ভ্রাতাদের কেহ বাড়ী করিয়াছেন, কাহারো সে-সৌভাগ্য হয় নাই; ভগ্নীগণ কেহ ধনীগৃহে পড়িয়াছেন, কাহারো অবস্থা মধ্যম; সেজ ভ্রাতার ছেলেরা সকলেই উচ্চ চাকুরি করিতেছে, বড় ভ্রাতার ছেলেরা ততটা সমৃদ্ধ নয়; কন্যাদের কাহারো গরীবের ঘরে বিবাহ হইয়াছে, কাহারো জামাতা বিদ্বান, কাহারো প্রভূত

অর্থশালী ; কাহারো ছেলেটি পড়াশুনায় ভালো হইয়াছে, কেহ বিস্তর পয়সা করিয়াছে, কোনো ঘরে বধূ আসিয়াছে পরমাসুন্দরী। সমস্তটা জড়াইয়া সারা বৎসর ধরিয়া পরস্পরের মধ্যে একটি অনতিপ্রচ্ছন্ন রেষারেষি চলিতেছে। সম্পর্ক খুব মধুর নহে। ইহারা উহাদের পছন্দ করে না। কাহারো ঘরের কথা অপরের অবিদিত নয়। এ বাড়ীতে টুঁ শব্দটি হইলে অন্য বাড়ীতে উহা বজ্রনির্ঘোষের মত শোনা যায়। পরস্পর পরস্পরের প্রতি অসহিষ্ণু, কিঞ্চিদধিক ঈর্ষাপরায়ণ ও কুৎসাপ্রবণ। প্রতি পরিবারেই অপর পরিবার সম্বন্ধে মন্তব্য হইতেছে ঃ মেয়েগুলি ন্যাকা, ছেলেগুলি চালিয়াৎ, জামাতাগণ অপদার্থ, কর্তা কৃপণ, গৃহিণী কোপন-স্বভাবা, বধূগণ গ্রাম্যতাদুষ্ট। বিবরণটি হয়তো চরম মাত্রায় গিয়া ঠেকিল। তবে, একটু কম-বেশি করিয়া ধরিলে চিত্রটি মোটামুটি ঠিক হইবে।

জানি না, আপনি এইরূপ একটি পারিবারিক পরিমণ্ডলের বাসিন্দা কিনা। যদি তাহা হন, তবে আত্মীয়-সঙ্কটের এই রূপটি আপনার অজানা থাকিবার কথা নহে। ইহার আভাস প্রবন্ধের গোড়ার দিকেই দিয়াছি। খণ্ড-খণ্ড পরিবারগুলির পরস্পরের প্রতি অন্তরঙ্গতা প্রদর্শন সামাজিক কর্তব্য, নহে তো লোকে ভাবিবে কী ? অথচ মন অতখানি অগ্রসর হইতে প্রস্তুত নহে।

সহযোগিতা-যে ইঁহাদের মধ্যে একেবারে নাই, তাহা নয়। বিবাহাদি ব্যাপারে কিংবা লৌকিক অনুষ্ঠানে ইঁহারা

অনাত্মীয়ের চোখে অভিন্ন। অর্থাৎ একটা আনুষ্ঠানিক আন্দোলন উপস্থিত হইলে পারিবারিক মহীরুহের শাখা-প্রশাখাগুলি একযোগে বেশ কর্ম্মচঞ্চল হইয়া ওঠে। কিন্তু উহা সেরেস্তাই মাত্র। আত্মবোধ ও স্বার্থবুদ্ধি সর্বদা সচেতন থাকাতে সত্যিকারের ঘনিষ্ঠ সহযোগ কখনোই হয় না।

এই অভিনব পরিবেশের মধ্যে আত্মীয়তার এক বিকট ব্যঞ্জনাও মাঝে মাঝে দেখিতে পাওয়া যায়। ধরুন, বড় তরফে কন্যার বিবাহ। অন্যান্য তরফ হইতে যে-সকল মহামূল্য উপঢৌকন আসিতে লাগিল, তাহা গৌণত স্নেহের নিদর্শন,—মুখ্যত নিজেদের সম্পন্ন অবস্থার অত্যুজ্জ্বল এবং অনস্বীকার্য অভিজ্ঞান। সেজ তরফের মেজ ছেলেটি পাঁচশো টাকা বেতনের চাকুরি পাইয়াছে, শোনা গিয়াছিল। ইহা অন্যান্য তরফে বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া গৃহীত হয় নাই, কারণ সেজ তরফের সকলেরই একটু অতিরঞ্জনের অভ্যাস। সেই পাঁচশত টাকা বেতনভোগীর আজ এতদিনে সুযোগ আসিয়াছে। সে তিনশো টাকা মূল্যের একখানি শাড়ি উপহার দিয়া বসিল,—উহা শাড়ি নহে, স্বর্ণখচিত স্বপ্নজাল। বড় তরফ একেবারে জব্দ, মুখে আর কথাটি নাই। অদূর ভবিষ্যতে একটা পাল্টা জবাব দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়া রহিল।

আপনি যদি এইরূপ কোনো-একটি বিচিত্র পারিবারিক নাটকের কেবলমাত্র দর্শক হন, তাহা হইলে কলিকাতায় গিয়া আত্মীয়-সংসর্গে সময়টা কাটিবে ভালো। বন্ধুগৃহের

আড্ডা ছাড়িয়া আত্মীয়-মহলে ক'টা দিন ঘুরিয়া আস্থন। নিমন্ত্রণাদি সম্বন্ধে একটু সাবধান থাকিয়া চক্ষুকর্ণ খুলিয়া রাখিলে বিনি পয়সায় বহু আনন্দের খোরাক জুটিবে। বন্ধুগণ অভিমান করিবেন? তাহা উপেক্ষণীয়।

মেয়েরা

যে-ভয়টা পাইতেছিলাম, তাহাই হইল। টাই-টা আর বাঁধিতে পারি না। পশ্চিমে চাকুরি পাওয়া অবধি অনবরত প্র্যাকটিস করিতেছি। ওদেশে নাকি ধুতির রেওয়াজ-ই নাই, প্যাণ্ট কোট পরিতে হইবে। দিনরাত অভ্যাসের ফলে ইদানীং হাতটা বেশ পাকিয়াও আসিয়াছিল, এবং একরকম নিশ্চিন্ত হইয়াই ছিলাম। অথচ, কী ফ্যাসাদ, আজ চাকুরিতে প্রথম হাজিরা দিতে যাইব, আজই বিলকুল গোলমাল হইয়া গেল।

দিল্লিতে আসিবার পথে কলিকাতায় শ্বশুরালয়ে উঠিয়াছিলাম। সেখানে দেখিলাম শ্যালকগণ অবলীলাক্রমে টাই বাঁধিতেছে। কথা বলিতেছে, টাই বাঁধিতেছে; পুত্রকে পড়া বলিয়া দিতেছে, টাই বাঁধিতেছে; স্ত্রীর সঙ্গে কলহ করিতেছে, টাই বাঁধিতেছে। সে এক মহা তাজ্জবের ব্যাপার। দেখিয়া মনে করিলাম, আসলে এ নিশ্চয়ই অতি সহজ কর্ম। অতি সঙ্গোপনে একটি গলগ্রন্থি সংগ্রহ করিয়া বাথরুমে গিয়া দরজা বন্ধ করিয়া ফেলিলাম। কিন্তু কৃতকার্য্য হওয়া দূরের কথা, উহার প্যাঁচটাই ঠাহর করিতে পারিলাম না। গলাটা কেবল শুকাইয়া আসিতে লাগিল।

মিনিট দশেক কুস্তি করিয়া টাই-টা পকেটে ফেলিয়া বাহির হইয়া আসিতেই শ্যালিকার সঙ্গে চোখোচোখি।

শ্যালিকার সহিত রসিকতা না করিলে মান থাকে না। বলিলাম, বড় তৃষ্ণা পাইয়াছে, পানি-প্রার্থী হইয়া তোমার কাছে যাইব ভাবিতেছিলাম। কোথা হইতে হঠাৎ গৃহিণীর আবির্ভাব। কী কারণে তাঁহার মেজাজ চড়িয়া ছিল, জানি না। বলিয়া বসিলেন, কী যে সব গেঁয়ো রসিকতা কর, তার ঠিক নাই। শুনিয়া আমিও সপ্তমে চড়িলাম। একাদিক্রমে ব্যঙ্গ, শ্লেষ, তাড়না, তিরস্কার ইত্যাদি ছোটোখাটো স্টেশনগুলি পার হইয়া ভাষা যখন স্রেফ গালাগালির জংশনে পৌঁছিয়াছে, তখন গলদেশ বারো ইঞ্চি ফুলিয়া উঠিয়াছে, টাই বাঁধা আর চলে না।

আজ সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছি। টাই-টা আর বাগে অসিতেছে না। এদিকে সময় উত্তীর্ণপ্রায়, বালুকারাশি হু-হু বেগে বাহির হইয়া আসিতেছে। সুতরাং বহু ধ্বস্তা-ধ্বস্তির পর শেষাশেষি কোনোরকমে একটা ফাঁস আটকাইয়া দুর্গা বলিয়া ঝুলিয়া পড়িলাম।

চাঁদনির মোড়ে ইউনিভার্সিটির বাস্ ধরিতে হইবে। ঊর্দ্ধশ্বাসে লাল কেল্লা অভিমুখে কদম কদম বাঢ়াইয়া চলিলাম। বাস্ স্টপের নিকট আরো কয়েকটি ভদ্রলোক অপেক্ষমান। যাক, বাঁচা গেল। আমি ভাবিয়াছিলাম, কান ঘেঁষিয়া বাহির হইয়া গেল বুঝি! সময় তাহা হইলে এখনো আছে। তবু সঠিক খবরটা একবার লওয়া ভালো। ইঁহারা কোন বাস্-এর জন্য অপেক্ষা করিতেছেন কে জানে? হিন্দি ভাষায় একজনকে জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলাম, আমার প্রশ্ন

তাঁহার মালুম হইতেছে না। ইংরাজি প্রয়োগ করিয়া জানিলাম, আর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ইউনিভার্সিটি-যানেওয়ালী বাস্ আমাদের সমীপবর্তিনী হইবে।

ভদ্রলোকের কথা মিথ্যা নয়। সত্য-সত্যই অনতিকাল মধ্যে গবালিয়র অ্যাণ্ড নর্দার্ন ইণ্ডিয়া ট্রান্সপোর্ট কোম্পানির একখানি রক্তবর্ণ বাস্ স্ট্যাণ্ডের সম্মুখে আসিয়া ধুঁকিতে লাগিল। কিন্তু এ কী কাণ্ড? বাস্খানি যে একেবারে লোকে লোকারণ্য! ইহার ভিতর নেংটি ইঁদুরটি ঢুকিতে গেলে ল্যাজে মোচড় খাইয়া ফিরিয়া আসিবে, মনুষ্য তো দূরের কথা! নিতান্ত অদৃষ্টগুণে কয়েকজন যাত্রী নামিয়া গেলেন, তাই কোনো রকমে আমাদের উঠিয়া দাঁড়াইবার স্থান হইল। কিন্তু একে গরম, তদুপরি এই ভিড়, তাহারও উপর সমস্ত দেহ জুড়িয়া অনভ্যস্ত বিজাতীয় পোষাক। সমস্তটা মিলিয়া এমন-একটা অবস্থা যে মনে হইতে লাগিল—

কিন্তু মনে হইতে আর পারিল কই? পিছন হইতে এক বিষম ঠেলা খাইয়া সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িলাম। ব্যাপারটা কিন্তু মোটের উপর মন্দ হইল না। সামনের দিকটা অপেক্ষাকৃত ফাঁকা। এদিকটায় মহিলাদের আসন, তাই কিছুটা জনবিরল। মহিলাগণ জোড়ায়-জোড়ায় বসিয়া আছেন, মুখ ভরিয়া অতি নিশ্চিন্ত আরামের অভিব্যক্তি। একটি তরুণী আবার এক ডবল সীট জুড়িয়া একেবারে একক অধিষ্ঠিতা। তাঁহার পাশের জায়গাটি খালি—বিলকুল খালি। আমি সেই শূন্য আসনের সম্মুখেই দাঁড়াইয়া।

কিন্তু বেল পাকিলে কাকের আশা কী? উহা অনন্ত কাল খালি পড়িয়া থাকিলেও আমাকে দাঁড়াইয়া যাইতে হইবে।

বাস্ হু হু করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। কাশ্মিরী গেটে কিছু লোক নামাইয়া তদপেক্ষা বেশিসংখ্যক যাত্রী উঠাইয়া বাস্ রাজপুর রোড দিয়া রুদ্ধ নিঃশ্বাসে ছুটিয়াছে। সেই আসনটি পূর্ব্ববৎ এখনও শূন্য। খাবার দেখিয়া ক্ষুধা বাড়িবার মত ঐ শূন্য আসনটি দেখিয়া-দেখিয়া আমার অবস্থা ক্রমশঃ সঙ্গীন হইয়া আসিতেছে। ভারসাম্য রাখিবার কায়দাটি কলিকাতায় কিছুকাল শিক্ষা করিবার সুযোগ হইয়াছিল, তাই এখনো উর্দ্ধবাহু হইয়া দণ্ডায়মান আছি। সেই উত্তোলিত বাহুখানিতে রক্ত চলাচল বন্ধ হইয়া গিয়াছে, আঙুলের ডগাগুলি ভয়ানক শাদা দেখাইতেছে। দক্ষিণ পদের অবস্থা আরো শোচনীয়। তাড়াতাড়ি জুতা পরিতে গিয়া জুতার জিভটা উল্টাইয়া গিয়া একটা পিণ্ডে পরিণত হইয়া গিয়াছিল, উহা এখন পায়ের পাতার উপর জুতার ফিতায় এমন প্রচণ্ড শক্তিতে আটকাইয়া গিয়াছে যে, পা-টা টনটন্ করিতেছে। সর্ব্বোপরি, পিছন হইতে পৃষ্ঠদেশে ক্রমাগত একটা প্রগতির তাগিদ অনুভব করিতেছি। উহা পুরোবর্ত্তী কাহাকেও চালান করিয়া দিব, এমন কেহ নাই। সমস্ত ঝোঁকটা আমাকে একা সামলাইতে হইতেছে।

খাইবার পাস্ মার্কেট অতিক্রম করিবার পর আর পারিলাম না। মরীয়া হইয়া অতি কাতরকণ্ঠে সেই আসনস্থা তরুণীটিকে জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলাম, আমি কি তাঁহার

পাশের জায়গাটির একপ্রান্তে নিতম্বের একটুখানি অংশ রক্ষা করিতে পারি? ভাষা অবশ্যই অতখানি অশিষ্ট হয় নাই। তবে, বলিবার ভঙ্গি ও কাকু-র সাহায্যে এটুকু বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলাম যে যথাসম্ভব গা বাঁচাইয়া বসিব, অভব্যতা বিন্দুমাত্র হইবে না। আবেদন শুনিয়া তরুণীটি ঈষৎ আশ্চর্য্যান্বিতভাবে ভ্রূ-যুগল উৎক্ষেপণপূর্ব্বক বিশুদ্ধ ইংরাজিতে বলিলেন, কিন্তু ইহা যে মহিলাদের আসন। বিষম লজ্জিত হইলাম এবং তৎক্ষণাৎ সিধা হইয়া দাঁড়াইয়া বামপদে দেহভার অর্পণ করিলাম।

ভাগ্যক্রমে, ইউনিভার্সিটিতে পৌঁছিয়া দেখি, ঘণ্টার তখনও মিনিট কয়েক দেরি আছে। তাড়াতাড়ি জুতা খুলিয়া ফেলিয়া পদসেবায় নিযুক্ত হইলাম।

ক্লাশটি নেহাৎ ছোটো নয়। ছয়টি কলেজের পঞ্চম বার্ষিকী ছাত্র-ছাত্রী সমবেত হইয়াছে। হাজিরা হাঁকিয়া বক্তৃতায় প্রবৃত্ত হইলাম। ছাত্রগণ অতিমাত্রায় কৌতূহলী, তাহারা নূতন অধ্যাপকের বিদ্যাবুদ্ধি আঁচ করিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে, ইহা লইয়া আবার ক্লাশের পর জটলা করিতে হইবে তো। আমিও পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝিয়া চেয়ার ছাড়িয়া একেবারে ব্ল্যাকবোর্ডে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। ইকনমিক্সের অধুনাতম এবং জটিলতম রেখাঙ্কন-গুলি একে-একে তুলিয়া ধরিয়া উহাদের কিম্ভূতকিমাকার

অবয়বের অর্থ বুঝাইতেছি। ছাত্রগণ বুঝিতেছে, নতুন অধ্যাপকটি নিতান্ত পরিহসনীয় নহে।

হঠাৎ একসময়ে ক্লাশ-রুমের দরজা খুলিয়া একটি ছাত্রী প্রবেশ করিল। বিলম্বে আসাতে মুখে-চোখে একটু সঙ্কুচিত ভাব, কোথাও তাড়াতাড়ি বসিয়া পড়িবার জন্য দ্রুত দৃষ্টিতে স্থান খুঁজিতেছে। আরে, এ যে বাস্-এর সেই মেয়েটি! বসিবার দরকার তাহা হইলে কোনো-কোনো সময়ে সকলেরই হয়। সহর্ষে দেখিলাম, ক্লাশে একখানি চেয়ারও শূন্য নাই। বাছাধন এইবার বড়ো জব্দ হইয়াছেন। অতি নির্লিপ্তভাবে তুমুলতর উৎসাহে বক্তৃতা দিয়া চলিলাম —অর্থাৎ তোমার বসিবার জায়গা নাই তো আমি কী করিব? দরকার হইলে কর্তৃপক্ষের নিকট নালিশ জানাও গিয়া।

বোর্ডে আরেকটি ভয়ঙ্কর চিত্র আঁকিয়া মুখ ফিরাইয়া দেখি, মেয়েটি নাই। কোথায় গেল? ক্লাশ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল নাকি? ভালোই হইয়াছে, অসভ্য মেয়েটার উপযুক্ত শাস্তি হইয়াছে।

পরক্ষণেই লক্ষ্য করিলাম আমার চেয়ারটি অন্তর্হিত হইয়াছে। আরেকটু নজর করিয়া দেখিলাম, আমার চেয়ারখানি টানিয়া লইয়া সেই মেয়েটি পরম নিরুদ্বেগে বসিয়া-বসিয়া পেন্সিল কাটিতেছে।

গরমের ছুটি

গরমের ছুটিতে বহুদিন পর যখন বাংলাদেশে ফিরিব, তখন আমাদের ঢাকার সেই পুরাতন আড্ডাটি আবার কিছু-দিনের জন্য ঘোরতরভাবে জমিয়া উঠিবে, এই স্বপ্ন দেখিবার জন্য-ই যেন বাংলা দেশ ছাড়িয়া পশ্চিমে চাকুরি লইয়া গিয়াছিলাম। দিন গুণিতে-গুনিতে অবশেষে সত্যসত্যই একদিন সেই গরমের ছুটি সুরু হইয়া গেল এবং সে-রাত্রেই রওনা হইয়া পড়িলাম। ন' শো মাইল পাড়ি দিয়া কলিকাতা এবং পদ্মা পাড়ি দিয়া ঢাকা,—চাট্টিখানি কথা নহে। কিন্তু মনের আনন্দে যেন বাতাসে ভর করিয়া উড়িয়া আসিলাম। নারায়ণগঞ্জে পৌঁছিয়া অমৃতসাগর কলা-র পরিচিত আহ্বান কানে মধুবর্ষণ করিল।

ঢাকায় আসিয়া অবধি দেখিতেছি, যেমনটি কল্পনা করিয়াছিলাম, স্থানীয় আবহাওয়া তেমন অনুকূল নয়। ইতিমধ্যে বিলাতে যে এক ভারতীয় দল ক্রিকেট খেলিতে গিয়াছে, সেই ঘটনাটি আমার হিসাব হইতে বাদ পড়িয়া যাওয়াতে ঈপ্সিত বন্ধু-সাহচর্য্য এখন পর্য্যন্ত অবাস্তব হইয়া রহিয়াছে।

তিন বন্ধুর এক অত্যুষ্ণ আড্ডায় অবান্তর চতুর্থরূপে প্রতি সন্ধ্যায় আসিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকি। বন্ধুগণ অক্লান্ত উৎসাহে ক্রিকেট আলোচনা করেন। আমি সারাক্ষণ

সংবাদপত্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া সিগারেটের পর সিগারেট ধ্বংস করি। তাঁহাদের কথোপকথনের কাকু ও ভঙ্গিতে বুঝিতে পারি, সম্রাটের খাসমহালে একটা অতি রোমহর্ষক কাণ্ড চলিতেছে, ভারত-স্বাধীনতার পূর্ব্বলক্ষণ-ই বা দেখা যাইতেছে। কিন্তু মনে উৎসাহ জাগে না। ক্বচিৎ কোনো-দিন অসতর্ক মুহূর্ত্তে অন্য প্রসঙ্গ উঠিয়া পড়িলে, আমি একটু নড়িয়া-চড়িয়া বসিতেই আড্ডা ভঙ্গ হয়, কারণ রেডিয়োতে বাংলা খবরের সময় হইয়া গিয়াছে, এমন প্রতিবেশী নরেন বাবুর বাড়ীতে খেলার খবরটা শুনিতে হইবে।

দিন পনেরো যাবৎ ইহাই চলিতেছে।

একদিন বিরক্ত হইয়া অন্য আড্ডার সন্ধানে ওয়ারীতে চলিয়া গেলাম। সেখানে পৃথ্বীশবাবু আছেন, শশীবাবুকেও হয়তো পাওয়া যাইবে, নয়তো ডাকাইয়া আনা যাইবে, আড্ডাটি মন্দ হইবে না।

সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। পৃথ্বীশবাবুর বাড়ীতে পৌঁছিয়া দেখি, গৃহ অন্ধকার, জন-মানবের সাড়াশব্দ নাই। ইহাতে অবশ্য কিছুই প্রমাণিত হয় না, তাহা পূর্ব্ব অভিজ্ঞতা হইতে জানা ছিল। হাঁকিলাম ঃ

"পৃথ্বীশ বাবু বাড়ী আছেন ?"

ক্ষণমধ্যে দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল।

"বাবু বাড়ীতে আছেন ?"

চাকর জানাইল, আছেন, ঐ ঘরে।

"অন্য কেউ আছেন নাকি ?"

"হাঁ, শশীবাবু আছেন।"

শুনিয়া সাতিশয় হৃষ্ট বোধ করিলাম। একেবারে যেমনটি চাহিয়াছিলাম।

বাড়ীতে বিজলিবাতি বিগড়াইয়া গিয়া থাকিবে। বাহির হইতে দেখিলাম, মোমবাতির স্বল্পালোকে দুইটি মাথা মুখোমুখি বসিয়া। মাঝখানে একখানি চতুষ্কোণ কাগজ-খণ্ড, মস্তকদ্বয়ের দৃষ্টি উহার উপর ঘন-নিবদ্ধ। আমি ঘরে ঢুকিতে চারি চক্ষুর দৃষ্টি পরিবর্তন হইল। অধর-প্রান্ত বাঁকাইয়া মুহূর্তের স্মিতহাস্যে ভদ্রতা সারিয়া উভয়ে পুনরায় ধ্যানস্থ হইলেন। প্রথমটায় ভাবিয়াছিলাম, দাবা খেলা হইতেছে, এখন লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম, ভাগ্য-গণনার খেলা চলিতেছে—একখানি রাশিচক্রের অন্তর্নিহিত গ্রহ-উপগ্রহের ঘাত-প্রতিঘাত নিরূপিত হইতেছে।

"চন্দ্রস্থান বলছেন?"

"হুঁ"

"কিন্তু—"

কথোপকথন বিশেষ নাই। এই হুঁ-হাঁ, কেন-কিন্তু-ই মাঝে-মাঝে অসংলগ্নভাবে অস্ফুটস্বরে উচ্চারিত হইতেছে। প্রায়ান্ধকার ঘরটিতে ইঁহাদের এই স্তিমিতকণ্ঠ এক বিজাতীয় রহস্যের অবরোধ সৃষ্টি করিয়াছে, বসিয়া ভালো লাগে না। অবান্তর ভাবে আধঘণ্টা খানেক কাটাইয়া উঠিয়া পড়িলাম।

"চল্লেন?"

"হ্যাঁ, আরেকদিন আসবো।"

"একটা মজা লক্ষ্য করেছেন ?"

প্রশ্নটি আমাকে নয়। ঐ রাশিচক্রের ছকে কোথাও একটা 'মজা' আবিষ্কৃত হইয়াছে। আমি ঘর হইতে সম্পূর্ণ অপসৃত হইবার পূর্ব্বেই দু'জনে সেই মজা লুটিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এতদিনের সুখ-স্বপ্নের এই পরিণতি! খেলা-র মর্ম্ম জীবনে কোনোদিন বুঝিলাম না, বুঝিব-ও না। আর ভাগ্য গণনা—ভদ্রভাষায় বলিতে গেলে—আমার বুদ্ধির অনধিগম্য। সুতরাং এবারকার গ্রীষ্মাবকাশ একা-ই কাটাইতে হইবে দেখিতেছি। রেল-ধর্ম্মঘট সুরু হইবার পূর্ব্বে ফিরিয়া-ই যাইব কিনা ভাবিতেছি।

কিন্তু দোষ দিব কাহাকে ? আমার নিজের উৎসাহ-ই এত সীমাবদ্ধ যে, অনেক সময়ে মনে হয়, পৃথিবীতে আসিবার এত বড় একটা সুযোগ পাইয়াও এখানকার সমস্ত কিছু উপভোগ করিয়া যাইতে পারিলাম না। এক-একজন আছেন, কতকটা রুচি-রহিত ঔদরিকের ন্যায় পৃথিবীর যাবতীয় জিনিসের প্রতি তাঁহাদের অক্লান্ত লুব্ধতা, কোনোটি ছাড়িয়া দিতে নারাজ। সাহিত্য বলুন, খেলা বলুন, পরচর্চ্চা, বাজার দর, সঙ্গীত অথবা রাজনীতি, প্রতি বিষয়ে তাঁহাদের সমান উৎসাহ। কোনো আড্ডায় তাঁহারা অবান্তর নন, কোথাও তাঁহাদের সময়ের অপচয় নাই। পৃথিবী যেন জলে স্থলে অন্তরীক্ষে ইঁহাদের জন্য আনন্দের মেলা পাতিয়া রাখিয়াছে, অবাধে গলা বাড়াইয়া বেলফুলের মালা পরিগ্রহ

পূর্ব্বক যাবতীয় সভায় আসন গ্রহণ করিতেছেন এবং উৎসব শেষে হৃষ্টচিত্তে বাড়ী ফিরিতেছেন।

এতখানি সর্ব্বভুক্ অবশ্য সকলে নয়। কিন্তু আমার নিজের দুরবস্থায় ইদানীং ধারণা হইতেছে, ভোজ্যের সংখ্যা কিছু বেশি থাকিলে মন্দ হয় না। অন্ততঃ ভোগ করিবার ক্ষমতায় খানিকটা প্রসারের অবকাশ থাকা ভাল। আমাদের অমলেন্দুকেই ধরুন না কেন। ঔদরিক না হইলেও সে মোটামুটি ভোজন-উৎসাহী। অনেক-কিছুই সে পছন্দ করে, অনেক জিনিস সম্বন্ধে তাহার কৌতূহল আছে, বহুবিধ তথ্য নখদর্পনে ঝল্সাইতেছে। সুতরাং তাহাকে কোথাও হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকিতে হয় না। নানা বিষয়ের এবং নানা স্তরের আলোচনায় তাহার দক্ষতা লক্ষ্য করিলে আপনি সত্যই অবাক হইবেন। কোথাও সে থমকাইয়া নাই, অনেক বিষয়েই তাহার একটি সুগঠিত অভিমত আছে, এবং তাহা সুন্দরভাবে প্রকাশ করিবার ক্ষমতাও সে রাখে। ফলে, কোথাও কেবলমাত্র বোদ্ধার ভান করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে হয় না। এই অভিনয়টি কিন্তু বেগতিকে পড়িয়া আমাকে শিক্ষা করিতে হইয়াছে। আগড়ুম্ ছাড়িয়া বাগড়ুমের আলোচনা আরম্ভ হইলেই তো তলাইয়া গেলাম। তখন, কোনো আসরে অজ্ঞতা ঢাকিবার জন্য, কোথাও বা ভদ্রতা রক্ষার উদ্দেশ্যে, মুখমণ্ডলে কৌতূহলী শ্রোতার অভিব্যক্তি ফলাইয়া মহা উৎসাহিত ভাবে বসিয়া থাকি। ভাবখানা, বেশ

লাগিতেছে আপনাদের এই আলোচনাটি, তবে, আজ শুনিয়াই গেলাম, তর্কে ভিড়িতে বিশেষ উৎসাহ নাই।

কিন্তু শ্রোতা হওয়া সত্যি-সত্যি খুব সহজ নহে। যদি নিজের অজ্ঞতা সত্ত্বেও আলোচ্য প্রসঙ্গ সম্বন্ধে আপনার কৌতূহল থাকে, তাহা হইলে অবশ্য ভিন্ন কথা। কিন্তু অশ্রাব্য আলোচনার মাঝখানে বসিয়া থাকা বড় সুখের ব্যাপার নহে। যদি ভারতীয় দলের জয়-পরাজয় সম্বন্ধে আপনার কোনো উৎসাহ-ই না থাকে, তাহা হইলে, বিশ্বাস করুন, পাঁচ মিনিটের মধ্যে কেমন অসহায় বোধ করিতে থাকিবেন, এবং উঠিয়া পড়িবার অভদ্রতাটি অসম্ভব হইলে, ক্রমশঃ নিস্তেজ হইতে হইতে এক সময়ে এলাইয়া পড়িবেন।

অথচ ব্যক্তিগত রুচি এবং কৌতূহলের পরিধিটি নিতান্ত সঙ্কীর্ণ না হইলেই আর এ বিপত্তির আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু মুস্কিল হইল, উহা ইচ্ছা করিলেই বাড়ানো-কমানো যায় না। আমাকে মারিয়া ফেলিলেও আমি কোনো দিন খেলার মাঠে যাইব না। আপনাকে ঠেঙাইয়া শেষ করিলেও হয়তো আপনি কোনোদিন কবিতা পড়িবেন না। রুচি জিনিষটি সহজাত, উহার উপর জুলুম চলেনা। তাই প্রয়োজন মাফিক উহার হের-ফের ঘটানোও সম্ভব নহে।

আসল ব্যাপারটি হইল, কাহারো কাহারো উৎসাহ স্বভাবতঃই বহুমুখী, কাহারো বা সঙ্কীর্ণ। বহুমুখিতা-যে অতি লোভনীয়, সে কথাই এতক্ষণ বলিতেছিলাম।

আপনার আনন্দের খোরাক যত কম, আপনি তত ঠকিবেন, যত বেশি, তত জিতিয়া যাইবেন।

কিন্তু এক বিজাতীয় বহুমুখিতা আছে, যাহাকে রুচি নিরপেক্ষ বলিয়াছি, এবং সে ধরনের বহুরূপী উৎসাহ আমার মতে অসার্থক। যেখানে কোনো ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ নাই, কেবল দেহের কতকগুলি কৌতূহলগ্রাহী কোষের স্ফূর্তিমাত্র আছে, সেখানে উহা নিছক উপভোগ শক্তির বিকার। 'উপভোগ' শব্দটির মধ্যে ভোগের একটি মুখ্যরূপের ইঙ্গিত আছে। ভোগ্যের মধ্যে একটি প্রধান হইলেই অপরগুলি উপভোগ্য পর্য্যায়ে পড়ে। উপভোগ সেখানে উদ্বৃত্ত প্রাণশক্তির পরিচয়, প্রাচুর্য্যের নিদর্শন। সমুদ্রমুখী একটি বেগবান জলস্রোতের খানিকটা উপচাইয়া পড়িয়া যেমন খালবিল ভরিয়া ওঠে, ইহাও তেমনি। প্রাণের হিল্লোল এখানে দিগন্ত-প্রসারী, এবং সেই কারণেই উহার দুই চারিটা ধারা-স্রোত গ্রামাঞ্চলে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ঘাটের ও মাঠের অবান্তর বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া ফিরিলেও আপত্তি নাই। কিন্তু যেখানে এক মুষ্টিমনোহীন সজীবতা হাজার খানেক বদ্ধ জলাশয়ে ব্যাঙের ন্যায় লাফালাফি করিতেছে মাত্র, সেখানে হৃদয়-দিগন্তে সমুদ্র-রেখার ইঙ্গিত কোথায়? এ ধরনের সর্ব্বগ্রাসী উৎসাহে কোনো মনের পরিচয় পাওয়া যায় না, কোনো মূলের সন্ধান নাই। আড্ডার অসংবদ্ধ বৈচিত্র্যে ইহাকে আমরা আদর করি বটে, কিন্তু সত্যিকারের কোনো মূল্য দিই না, কারণ ইহাতে কোনো প্রকৃত শক্তির কিংবা সাধনার ইঙ্গিত নাই।

বিকিকিনি

আজকাল পুস্তকের দোকানগুলিতে পুস্তক ব্যতীত আরো নানাবিধ দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। যদি গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ফ্ল্যাট ফাইল আছে?" দেখিবেন, দোকানী ক্ষণ মধ্যে একখানি ডিক্‌শনারি আনিয়া হাজির করিয়াছে। আপনার আভিধানিক প্রয়োজন হয়তো আপাতত নাই। সুতরাং আপনি আশ্চর্য্য এবং ততোধিক বিরক্ত হইয়া বলিবেন, "এ কী আনলেন, মশাই? আমি চাইলাম ফ্ল্যাট ফাইল।" দোকানী অবিচলিত কণ্ঠে বলিবে, "কেন, এগুলো তো আজকাল খুব চলছে। নিয়ে যান না এক কপি।"

আপনি পুনরায় আপনার প্রযোজন নিবেদন করিবেনঃ "শুনতে ভুল করে থাকবেন। আমি ডিক্‌শনারি চাইনি। ফ্ল্যাট ফাইল আছে?"

"হ্যাঁ সে তো শুনেছি, ফ্ল্যাট ফাইল চাইছেন। না, সে এখন ষ্টকে নেই। তা' এর এক কপি—"

অতঃপর আর দোকানে সময় নষ্ট করা চলে না। আপনি অন্যত্র চেষ্টায় বাহির হইবেন।

যাহা বলিলাম, খুব-একটা অতিরঞ্জন নহে। কোনো-কোনো দোকানের নিয়মই হইল—না, খদ্দের চটানো নহে—তাহার প্রয়োজন সৃষ্টি করা। ফ্ল্যাট্ ফাইল নাই তো কী হইয়াছে? ডিক্‌শনারি তো আছে উহা যে আপনার লাগিবেই

না, এমন কথা শপথ করিয়া বলিতে পারেন না। দোকান হইতে বাহির হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, ছেলেটা একখানি ডিক্‌শনারির জন্য সত্যই বড় আবদার করিতেছে। নিয়া যাইব নাকি এক কপি? কিছুই বলা যায় না, হয়তো পুনরায় দোকানে ঢুকিয়া ফ্ল্যাট ফাইলের পরিবর্ত্তে একখানি অভিধান লইয়া বাড়ী ফিরিলেন।

এরূপ হামেশাই ঘটিতেছে, এবং আমার মনে হয়, এই ধরনের দোকানীদের নিকট আমাদের কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। কেনাকাটায় বাহির হইয়া প্রয়োজনগুলি প্রায়ই মনে থাকে না। ফলে তিন মাইল পথ দুইবার দৌড়াইতে হয়। ইহারা সেই পথশ্রান্তি দূর করেন বলিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন। অনেকে কিন্তু বিরক্ত হন। সেটা ঠিক নহে। প্রথমটায় একটু বিরক্তি ঘটিবারই কথা। এক ঘটি জলের পরিবর্ত্তে তৃষ্ণার্ত্তের নিকট একটী বিল্বফল আনিয়া হাজির করিলে ক্রোধ অনিবার্য্য। কিন্তু যে-মুহূর্ত্তে বুঝিবেন, অভিধানখানি আনা হইয়াছে নিতান্তই বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে, সেই মুহূর্ত্তে আপনার রাগ পড়িয়া যাইবে। অবশ্য ফ্ল্যাট ফাইলের প্রশ্নটি নিষ্পত্তি হইয়া যাইবার পরই অভিধানের প্রসঙ্গটি উত্থাপন করা উচিত। কিন্তু দোকানীর দিক হইতে যদি বিষয়টি বিবেচনা করেন তাহা হইলে আর ও কথা বলিবেন না। "ফ্ল্যাট ফাইল নাই" বলিবার সঙ্গে-সঙ্গেই তো আপনি চলিয়া যাইবেন, অভিধান সন্দর্শন কখন ঘটিবে? সুতরাং ঐ পথ অবলম্বন ব্যতীত দোকানীর গত্যন্তর নাই।

অনেকে বলেন, দোকানীর পক্ষে এই প্রকার দুষ্ট ফন্দিতে জিনিস গছাইয়া দেওয়া নিতান্ত জুলুম। কিনিতে গেলাম খোকনের জন্য ধাবাপাত, কিনিয়া ফিরিলাম খোকনের মায়ের জন্য সাবনশিক্ষা। কিন্তু ইহাতে ফন্দিটাই বা কী, জুলুমটাই বা কোথায়? বিজ্ঞাপনকে জুলুম বলিবেন কী হিসাবে? বাজারে খদ্দেরই রাজা। তাহার উপরে কথা বলে কাহার সাধ্য। বিক্রেতা কেবল অভিধানখানি দেখাইতেই পারে, কিন্তু কিনিবেন কিনা, সে আপনার মর্জ্জি। অবশ্য বলিতে পারেন উহারা লোভ দেখায় কেন? চোখ কান বুজিয়া একগজ মার্কিন কিনিয়া বাড়ী ফিরিবার কথা, তা নহেতো বাজ্যের শাড়ি আর ব্লাউস্‌পিস্ আনিয়া হাজির। স্ত্রী সঙ্গে থাকিলে তো কথাই নাই, একা গেলেও উহার দু'একখানি নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিতে দেখিতেই বাণ্ডিলভুক্ত হইয়া যায়। কিন্তু এক্ষেত্রেও দোকানীকে দোষ দেওয়া চলে না। মিষ্টান্নের দোকানে গিয়া আপনি অবশ্যই আশা করিতে পারেন না যে, আপনাকে দেখিবামাত্র উহারা সন্দেশ রসগোল্লা ইত্যাদি উৎকৃষ্ট সামগ্রীগুলি সরাইয়া ফেলিতে থাকিবে, যাহাতে দু'একখানি তেলেভাজা জিলিপি কিনিয়াই আপনি হৃষ্ট চিত্তে বাড়ী ফিরিতে পারেন।

কথাটি মনে ধরিল না বুঝি? আচ্ছা, অন্য এক রকম দোকানের কথা ভাবিয়া দেখুন। ছাতাটি বন্ধ করিয়া দোকানে গিয়া উঠিলেন। আপনাকে দেখিয়া কেহ সম্ভাষণও করিল না, আগাইয়াও আসিল না। যে যাহার স্থানটিতে

মহা বৈরাগ্যভরে উপবিষ্ট হইয়া রহিল। আপনি নির্ব্বোধের মত ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিলেন। তৎপর দ্বিধা সহকারে একজনের দিকে অগ্রসর হইতেই সে প্রকাণ্ড এক হাই তুলিল। আপনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "অমুক দ্রব্যটি আছে ?" হাই তখনও শেষ হয় নাই। সেই আল-জিহ্বা-প্রদর্শিত মুখ ব্যাদানের বিকৃত ভঙ্গিটি না মিলাইবার পূর্ব্বেই কণ্ঠ হইতে একটা মিশ্র ধ্বনি উদ্গত হইয়া আসিল। উহা যে নঞ্-বোধক তাহা মালুম হইল সমসাময়িক হস্তসঞ্চালনের ইঙ্গিতে। বিরক্ত হইয়া বাহির হইয়া আসিলেন।

এখন বলুন, দুই চারিটা উৎকৃষ্ট জিনিসের নমুনা দেখা ভাল, না ঐ বিশ্বরূপ দর্শনই বাঞ্ছনীয় ?

বাজারে যাওয়া আর দোকানে যাওয়ার মধ্যে তফাৎ আছে। তফাৎটা হইল, বাজারে দরদস্তুর কথা চলে, দোকানে চলে না।

"দাম কত ?"

"ডে-টাকা"

"বলেন কি ? এই জিনিসই তো ঐ দোকানে দেখে এলাম পাঁচসিকে।" আপনি ভাবিলেন খুব জব্দ কর' গিয়াছে। কিন্তু দোকানী কি বলিবে, জানেন ?

"তা হলে ওখান থেকেই নিন গে।"

বলিয়া পরম নিরুদ্বেগে অন্য খদ্দেরের প্রতি মনোনিবেশ করিবে। আবার কোথাও দেড় টাকা দাম শুনিয়া যদি পাঁচসিকার প্রস্তাব করেন, তাহা হইলে ঈষৎ উন্নাসিকতা

সহকারে কিঞ্চিৎ আশ্চর্যান্বিতভাবে দোকানী বলিবে, "দরাদরি কচ্চেন? এখানে ও সব নেই," এবং এমন সুরে যে, আপনি লজ্জিত হইবেন। মনে হইবে, তাই তো, ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরগণ আমাদের সুবিধার নিমিত্ত দয়া করিয়া পসরা সাজাইয়া বসিয়াছে, আর আমি কিনা চার আনা পয়সা ঠকাইয়া জিনিসটি হস্তগত করিতে চেষ্টা করিতেছি।

কিন্তু এই দুইটির কোনোটিই দোকানীর পক্ষে প্রশংসনীয় নহে। ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে যোগসূত্রই হইল জিনিসের দাম। দেড় টাকাই যে উপযুক্ত এবং ন্যায্য মূল্য তাহা বুঝাইবার চেষ্টা করাটা দোকানীর দায়। ঔদাসীন্য, তাচ্ছিল্য কিম্বা অপমানসূচক কথা এস্থলে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক। 'মূল্য' জিনিসটি আলোচনার বিষয়। মাথা বিক্রয় করিয়া জিনিস কিনিবার জন্য কেহ জন্মগ্রহণ করে নাই। দাম যদি একটু বেশি লইতে হয়, বোশটার জন্য জিনিসটিকে একটু শিষ্টতার মোড়কে বাঁধিয়া হাতে তুলিয়া দেওয়া দোকানীর কর্ত্তব্য।

সাহেবী দোকানে কোনোদিন গিয়াছেন? মেমসাহেব আপনাকে দেখিবামাত্র হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিবে, "আপনাকে কী ভাবে সাহায্য করিয়া ধন্য হইতে পারি?"

আপনি হয়তো বলিলেন, "আমার একটি ঝর্ণাকলমের প্রয়োজন।"

মেমসাহেব কৃতার্থ: "অতি আনন্দের কথা। ইজ্ ইট্ টু বি এ গিফ্‌ট্ ফর্ দি লেইডি"? বলিয়া বত্রিশ খানি

লেডিজ ফাউন্টেন পেন আপনার সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত করিয়া বসিবে। ইহা শিষ্টতার চূড়ান্ত চাতুরী। এতখানির প্রয়োজন নাই, উচিতও নহে। তবে ক্রেতা বিরক্ত হইয়া না ফেরে তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখা দোকানীর কর্তব্য।

সাহেবী দোকানের অনুকরণে ইদানীং কোনো-কোনো দিশি দোকানে (বিশেষতঃ কাপড়ের দোকানে, কাপড় কিনিতে অনেক সময় যায়) ভদ্রতা পরিবেশন সুরু হইয়াছে। কেবল মিষ্ট হাসি নহে, পান-সিগারেটের বন্দোবস্তও থাকিতে দেখা যায়। কাউন্টারে এদেশে এখনো নারীর আবির্ভাব হয় নাই। সুতরাং হাসিটা ঠিক রমণীয় হয় না বলিয়া তাম্বুলাদির আয়োজন রাখিতে হয়। আপনি দোকানে প্রবেশ করিতেই পাঁচ ছয় জোড়া বিকশিত দন্তপংক্তি আপনাকে অভ্যর্থনা করিবে। ভাবটা, আপনি কালে ভদ্রে এখান হইতে দু এক গজ লংক্লথ কিনিয়া লইয়া যান বলিয়াই না উহারা এখন পর্য্যন্ত কোনো প্রকারে টিকিয়া আছে! একটি বিষয়ে কিন্তু সাবধান করিয়া দেওয়া দরকার। যদি পাসিং শো খাইবার অভ্যাস না থাকে, তাহা হইলে নিজের একটি ধরাইয়া দোকানে প্রবেশ করা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভালো।

এ যাবৎ কেবল বিক্রেতার কথা বলিয়াছি। এবার অপর পক্ষ সম্বন্ধে দু একটি কথা বলি। ক্রেতার দিক হইতে যে একেবারেই কোন ত্রুটি নাই, তাহা নহে। তাঁহাদেরও কোনো-কোনো বিষয়ে দোষ দেখা যায়। মূল্যের ব্যাপারটাই ধরুন। দেড় টাকা চাহিলে চোদ্দ পয়সায় দিবে কিনা,

এইরূপ বিজাতীয় অনুসন্ধান না করাই ভালো। উহাতে কোনো পক্ষের সুবিধা হইবার কথা নহে, বরং বৃথা সময়ের অপচয়। এ বিষয়ে মেয়েদেরই বেশি নির্লজ্জ হইতে দেখা যায়। মেয়ে মাত্রেরই ধারণা, তাহার চটকে (সে যে-কারণেই হউক) ষোলো আনা হইতে বারো আনাই ঠিকরাইয়া পড়িবে।

মেয়েদের আরেকটী দোষ দেখা যায় দ্রব্য নির্ব্বাচন ব্যাপারে। ইহারা কী চান তাহা জানেন না, কী চান না, তাহাই কেবল বলিতে পারেন। ফলে, কাপড়ের দোকানে শাড়ির উপর শাড়ি পর্ব্বত প্রমাণ হইয়া উঠে, স্টেশনারি দোকানে হরেক রকম জিনিসে কাউণ্টার বোঝাই হইয়া যায়, জুতার দোকানে গিয়া আবিষ্কৃত হয়, ঠিক তাঁহার পছন্দ মাফিক জোড়াটিই এখন পর্য্যন্ত তৈরী হইয়া আসে নাই। আপনি যদি ইহার সাথী হইয়া আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে লজ্জিত হওয়া ছাড়া উপায় থাকে না। যদি একটা-কিছু সমাধা তাড়াতাড়ি করাইয়া ফেলিবার চেষ্টায় বলেন, 'এই শাড়িটাই নাও না', শুনিবেন, উহার পাড়টি অত্যন্ত বোকা বোকা। 'তাহলে এটা?' উহার রংএর বোকামিটা আরো ঘোরতর। শাড়ির অরণ্যের মধ্যে চালাক শাড়িটি আর খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। জুতা কিনিতে গিয়া যখন দোকানের সমস্ত বাক্সগুলি নামানো হইয়া গিয়াছে, তখন দেখিবেন, আপনার সঙ্গিনী অম্লানবদনে বলিতেছেন, পাশের দোকানটা দেখে আসি। সেখানে আবার সেই একই

ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি। এই সময়ে বাহিরে আসিয়া যদি দুই দোকানের মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়ান, তাহা হইলে দেখিবেন, এক দোকানে জুতা র‍্যাকের উপর উঠিতেছে, অপর দোকানে জুতা র‍্যাক হইতে নামিতেছে।

ক্রেতার আর কটি দোষ উল্লেখযোগ্য। সেটি হইল জিনিস অন্যায়ভাবে পরীক্ষা করা। স্নো কিংবা ক্রীম কিনিতে গিয়া পট্ হইতে এক খাব্‌লা আঙুলে উঠাইয়া লওয়া (মেয়েরা হয়তো একটু মাখিয়াও দেখেন), চিকণীর ধার নির্ণয়ের জন্য উহা মাথার চুলে চালাইয়া দেখা, ব্লেড কিনিতে গিয়া মরিচার সন্ধানে মোড়কটি আদ্যোপান্ত খুলিয়া ফেলা, টুথ ব্রাশটি ভোঁতা কিনা বুঝিবার জন্য হাতের তেলোতে ক্ষৌরকারের ক্ষুর চালানোর পদ্ধতিতে বার কতক ঘষিয়া দেখা ইত্যাদি। যদি অপছন্দ হয়, জিনিসগুলি অল্পবিস্তর নষ্ট হইয়া রহিল, তাহাতে দোকানীর ক্ষতি। এটুকু বিবেচনা ক্রেতার থাকা উচিত, এবং জিনিস পরীক্ষার সময় কোন ক্ষতিকর প্রণালী অবলম্বন করা কখনোই শোভনীয় নহে।

জিনিস দেখিয়া বেড়ানো কোনো-কোনো ব্যক্তির ব্যসন। কিনিবার উপস্থিত বাসনা কিংবা শক্তি নাই, তবে নয়নানন্দ-টাই মন্দ কি? অনেক অবসরপ্রাপ্তগণ বাজারে বেড়াইতে যান। চাউলের দাম কত চড়িল, ইলিশ মৎস্যের আয়তন আরেকটু বাড়িল কিনা, নূতন গুড় কবে উঠিবে ইত্যাদি মহামূল্য তথ্য সংগ্রহ করিয়া ইহারা বাড়ী ফেরেন। দোকানে দোকানে কাচের আলমারি দেখিয়া বেড়ানোটাও খুব নির্দ্দোষ

আমোদ। ঘ্রাণে ও দর্শনে অর্দ্ধেক ভোগ হইয়া যায়। কিন্তু যাহারা না-বাজার না-দোকান অর্থাৎ যাহারা ফেরীওয়ালা, তাহাদের পক্ষে এই ব্যসন অত্যন্ত মারাত্মক। হরেকরকম ছিট এবং বহুবিধ কটাহ সন্দর্শনের পর গৃহিনী অত্যন্ত নির্ব্বিকার চিত্তে দ্বাররুদ্ধ করিয়া কার্য্যান্তরে মনোনিবেশ করিলেন। ফেরীওয়ালার বহু সময় নষ্ট হইল। একখানি জিনিসও বিকাইল না। তবে, মুটেটার কিছুটা বিশ্রাম হইল।

বোধহয় মমতাময়ীর উহাই আসল উদ্দেশ্য ছিল।

জনসাধারণ

সংখ্যা-শাস্ত্রে 'র‍্যাণ্ডম্ স্যাম্প্লিং' বলিয়া একটা কথা আছে। নমুনা পরীক্ষা করিয়া একটি সমষ্টির দোষ-গুণ বিচার করিতে হইলে নমুনা সম্বন্ধে সতর্ক হওয়া আবশ্যক। ফেরিওলার নিকট হইতে আম কিনিবার সময় ক্রেতা ও বিক্রেতার দ্বন্দ্বটা ভাবিয়া দেখুন। নমুনা দেখাইবার জন্য ফেরিওলার দু'একটি আম নির্ব্বাচিত হইয়া আছে। সে উহাই তুলিয়া ধরে ও ছুরি দিয়া কাটিয়া দেখায়। ক্রেতা তাহাতে সন্তুষ্ট নয়। সে যে-কোনো একটি উঠাইয়া লইয়া চাখিয়া দেখিতে চায়, কারণ আসলে উহাই প্রকৃষ্টতর পরীক্ষা। নির্ব্বাচন এড়াইয়া নমুনা সংগ্রহের নাম 'র‍্যাণ্ডম্ স্যাম্প্লিং'। নমুনা যত নির্ব্বাচন-বর্জ্জিত হইবে, সমষ্টির বিচার তত খাঁটি হইবে, এ বিষয়ে মতদ্বৈধ হইবার কারণ নাই।

শিক্ষিত বাঙালি জনসাধারণের একটা র‍্যাণ্ডম্ স্যাম্প্‌ল্ কী প্রক্রিয়ায় সংগৃহীত হইতে পারে, একদা সেই কথা ভাবিতেছিলাম। পাছে সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় পড়িয়া যাই, তাই প্রথমে মোট জনসংখ্যা হইতে অহিন্দু অংশটা বাদ দিয়া ফেলিলাম। অতঃপর চিন্তা করিয়া দেখিলাম, কাঁচা ও পাকা আমের র‍্যাণ্ডম্ নমুনা অর্থহীন। সুতরাং পুনরপি ছাঁটিতে হইল। হরিজন বর্জ্জন করিয়া যাহা দাঁড়াইল, তাহা লইয়া আবার আরেক ফ্যাসাদ! স্ত্রীলোক রহিয়া গেল যে! উহাদের সংস্রবে যথাসম্ভব না আসাই ভালো। কাজেই

তৃতীয় দফায় কাঁচি চালাইতে হইল। দেখিলাম, সংখ্যাটি এখন অনেকটা আয়ত্তের মধ্যে আসিয়াছে। এবারে বালকগুলিকে খেদাইতে হইবে। উহারা আবার জনসাধারণ কি? খুন করিলেও যাহাদের ফাঁসি হয় না, তাহারা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নয়। বালক অন্তর্হিত হইয়া বিয়োগান্ত নাটকের শেষ দৃশ্যে যে সংখ্যাটি প্রকট হইল, তাহার আয়তনটি বৃহৎ নহে।

এমন সময় হঠাৎ খেয়াল হইল, এতগুলি বিয়োগ অঙ্ক এই বয়সে অনর্থক করিলাম। র‍্যাণ্ডম্ স্যাম্প্ল্-এর জন্য ইহার দরকার ছিল না। বাংলা দেশে যে-কোনো ট্রেনের মধ্যম শ্রেণীতে যে কয়টি যাত্রী পাওয়া যায় (হালের কথা নহে, বলা বাহুল্য) তাঁহারাই শিক্ষিত বাঙালি জনসাধারণের অনির্ব্বাচিত নমুনা, অর্থাৎ র‍্যাণ্ডম্ স্যাম্পল্। এই অতি সহজ পন্থাটি যে কেন মনে আসে নাই ভাবিয়া পাই না। মনে আসিবার সঙ্গে-সঙ্গে সমস্যার সমাধানও হইয়া গেল। কারণ রেল-ষ্টিমারের মাধ্যমিক জগৎ আমার অপরিচিত নহে।

শিক্ষিত বাঙালি জনসাধারণ লেখাপড়া-জানা লোক। কিন্তু লেখার অর্থ চিঠি লেখা এবং পড়ার অর্থ সংবাদপত্র পাঠ। দৈনন্দিন জীবনে লিখন ও পঠন এই দুইটি নির্দ্দিষ্ট সীমায় আবদ্ধ। মাসিক-পত্রাদি কিংবা দু একখানি গল্প-উপন্যাস যে একেবারেই কেহ পড়েন না, তাহা নহে। তবে, উহা সময় কাটাইবার উদ্দেশ্যে, সাহিত্যানুরাগের জন্য নহে।

কিন্তু তাই বলিয়া ইঁহারা সাহিত্যিক-মতামত-বর্জ্জিত বলিয়া মনে করিলে ভুল হইবে। ইহারা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য-সম্রাট, রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি এবং শরৎচন্দ্র অপরাজেয় কথাশিল্পী। বঙ্কিমচন্দ্র যাহা লিখিয়া গিয়াছেন সে-রকমটি আব কোনো কালে হইতে হয় না, ইহাও তাঁহারা প্রত্যেকে জানেন। রবীন্দ্রনাথও কম শ্রদ্ধার পাত্র নহেন। বিবাহের উপহার দিতে হইলে এক খণ্ড 'বলাকা' কে না কিনিয়া দেয়? উহাতে কী উচ্চশ্রেণীয় সব কবিতা! আর সেই যে "বহে মাঘ মাসে শীতের বাতাস"? উহার মত আর কিছু আছে নাকি? শরৎচন্দ্রও নমস্য। ক্যারাক্টার ফুটাইতে এমনটি আর কে পারিল?

কবিতা ইহারা কেহ পড়েন না। কারণ, কবিতা এক বিশেষ শ্রেণীর লোকের উপজীব্য। অপেক্ষাকৃত প্রবীণের মধ্যে যাঁহারা একটু কাব্যামোদী, তাঁহারা অতখানি ছাড়িয়া দিতে রাজী নন! তাঁহারা "দাঁড়া রে দাঁড়া রে ফিরে, দাঁড়া রে যবন" বলিয়া ঈষৎ উত্তেজিত বেগে মস্তক সঞ্চালন করিয়া থাকেন।

বিচার বিশ্লেষণাদির প্রতি ইঁহাদের কোনো পক্ষপাত নাই। মানিয়া লইতে পারিলে আর কথা নাই। এই শিরোধারণ প্রবৃত্তি দেশের ঐতিহ্য প্রসঙ্গে সর্ব্বাপেক্ষা তীব্র। "গীতায় আছে—"তবে তো মিটিয়াই গেল। "উপনিষদ বলে—"আর কথা কি? ইহারা শ্রোতার দল। যাঁহারা

বক্তা, তাঁহারা কোথাও কোনো বিদ্বানের আলোচনা শুনিয়া থাকিবেন। যাহা কর্ণগোচর হইয়াছে তাহার কিছুটা তাল-গোল পাকাইয়া মাথায় রহিয়া গিয়াছে। ফলে, বর্ণাশ্রম—সনাতন—দ্বৈত-অদ্বৈত—তৈত্তিরীয়—ছান্দোগ্য—খনা—গার্গী—রামমোহন-কেশব সেন ইত্যাদি শব্দচ্ছটা বিকীরণ করিয়া গোয়ালন্দ না পৌঁছানো পর্য্যন্ত অনর্গল বকিয়া যান। শ্রোতার দল মুগ্ধ হইয়া শোনে। মনে মনে বলে, লোকটা পণ্ডিত।

ইঁহারা মোটামুটি ধর্ম্মভীরু ও ঈশ্বরবিশ্বাসী। যাঁহাদের তারুণ্যের ছোঁয়াচ এখনো কাটে নাই, অথবা অকালে লাগিয়াছে, তাঁহারা পথে কালী মন্দির পড়িলে কপালটা অন্ততঃ একবার চুলকাইয়া লন। দৈবে প্রবল বিশ্বাস। স্টিমারে স্টেশনে স্বপ্নলব্ধ মাদুলির অজস্র বিক্রি। দুই আনা দাম বলিয়া কাহারো গায়েও লাগে না। দু এক জন মুখে বলেন, উহা বুজরুকি। কিন্তু কাজে ব্যতিক্রম হয় না, যদিও সাফাই স্বরূপ বলেন, টাকাটা ভাঙাইয়া লইলাম আর কি। দশটা-পাঁচটার তাড়ায় পূজা-আহ্নিক-বর্জ্জিত হইয়া ধর্ম্মটা এখন তেত্রিশ কোটিকে ঘিরিয়া একটা ব্যঞ্জনায় পর্য্যবসিত হইয়াছে।

যাঁহারা অপেক্ষাকৃত নব্য, শিক্ষাভিমানী ও সংস্কারমুক্ত তাঁহারা—নিজেদের অজ্ঞাতসারে—অন্যান্যদের মতই অন্ধ বিশ্বাসী। "শাস্ত্রে বলে—"বলিলে তাঁহারা হাসিবেন, কিন্তু "বিজ্ঞানে বলে—"বলিলে আর আপত্তি নাই। একটা

কিছু অবলম্বন চাই, তারপর উহার নামে যাহা খুসি চালাও, দ্বিরুক্তি হইবে না। যদি বলা হইল, অমাবস্যা ও পূর্ণিমায় নিশিপালন পঞ্জিকামতে প্রশস্ত, ইহারা হাসিয়া আকুল হইবেন। কিন্তু যদি বলা যায়, চন্দ্রসূর্য্যের আকর্ষণে সমুদ্র মথিত হয় আর তাহারই হেক্সা-টেক্সা-হাইড্রেশনে শরীরের ফ্যাগোসাইটো-গ্লোবিয়ার ক্যাটাবলিজম্ নিবন্ধন শরীর অসুস্থ হয়, এবং সেজন্য রাত্রে অনাহার প্রশস্ত, তাহা হইলে আর মানিয়া লইতে আপত্তি নাই। ইহারা পৌত্তলিকতা বর্জ্জন করেন নাই, পুত্তলিকার পরিবর্ত্তন করিয়াছেন মাত্র। ইহাদেরই একজন ট্রেন-শুদ্ধ লোককে তুষ্ণীম্ভূত করিয়া দিয়া বলিতেছিলেন, "আরে মশাই, আমাদের দেশের কথা আর বলেন কেন? এই ধরুন না, এ মাসটা যাচ্ছে মলমাস। মাসে দু'টো অমাবস্যা পড়লো তো পূজোপার্ব্বন বন্ধ! এই সব কুসংস্কারের জন্যেই তো—"। হিন্দু জ্যোতিষ কি কারণে মলমাসের কল্পনা করিয়াছে, তাহা যাঁহাদের জানা আছে, আশা করি তাঁহারা এই অর্ব্বাচীনকে ক্ষমা করিবেন।

গায়ে পড়িয়া আলাপ করিবার অভ্যাসটা যেন একরকম অসম্বরণীয়। ট্রেনে-স্টিমারে কদাচিৎ কেহ চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন। যাঁহার যেখানে বাস, সেখানে দুগ্ধ-মৎস্যাদি সুলভ কিনা তাহাই প্রধান আলোচ্য বিষয়। ইদানীং যুদ্ধ বাধিবার পর হইতে এ প্রসঙ্গটি আরো প্রাসঙ্গিক হইয়াছে। যুদ্ধটাও আলাপের একটি নূতন বিষয়। তবে বিশদ আলোচনায় ভূগোল-নিষ্ঠা দেখা যায় না। যিনি আলাপে

যোগদান না করিয়া আপন মনে খবরের কাগজ পড়িতেছেন, তিনি বিনামূল্যে পাওয়া সুবিধার সদ্ব্যবহার করিতেছেন। ইহাতে লজ্জা নাই। কারণ আত্মপর জ্ঞানটা বিজাতীয়, আমাদের পক্ষে ওসকল কৃত্রিমতা অসম্ভব।

ভাষা-জ্ঞান খুব প্রথম শ্রেণীর নহে। বাংলার সহিত প্রচুর ইংরাজি শব্দ মিশাইয়া কথা বলিবার অভ্যাস। কয়েকটি ইংরাজি শব্দ একেবারে অসহ্য। যাত্রীদের মধ্যে কেহ ওয়াইফের অসুখের জন্য কলিকাতায় যাইতেছেন; অন্য কেহ ভগ্নীপতি ফরেইন্-এ যাইবেন বলিয়া বিদায় দিতে চলিয়াছেন; অপর একজন অনুপস্থিত কোনো ভদ্রলোকের জামাতা-নির্ব্বাচনের নির্ব্বুদ্ধিতা প্রমাণ করিবার জন্য বলিতেছেন; ছেলেটা একেবারে লুস্ ক্যারাক্টার, ড্রিঙ্ক্ তো করেই—।' বাংলা কিংবা ইংরাজি কোনোটাই ভালো জানা না থাকাতে অহরহ শব্দের অপব্যবহার ঘটে। চিঠিপত্রে বর্ণাশুদ্ধি, ব্যাকরণ-দুষ্টতা ও রচনার ত্রুটি দেখিয়া মনে হয়, কাগজ-কলমের সংযোগটাই যেন অশুভ। পত্রখানি যদি বা কোনো রকমে উৎরাইলো, উপসংহারে শারিরীক কুশল চাহিয়াই সমস্ত মাটি হইয়া গেল। শব্দের অপব্যবহার অত্যন্ত কৌতুকজনক। ট্রেনে একদিন গাড়ি ধরিবার কথা লইয়া আলোচনা হইতেছিল। একজন বলিতেছিলেন, তিনি এক ঘণ্টা সময় থাকিতে স্টেশনে আসেন, কারণ মুহুর্মুহুঃ সময়ে আসিয়া দৌড়াদৌড়ি করা তাঁহার পোষায় না। মুহুর্মুহুঃ সময়ের অর্থ বোধ হয়, যে সময়ে আসিলে

হুড়মুড় করিয়া গাড়িতে উঠিতে হয়। অপর এক স্টিমারযাত্রী বলিয়াছিলেন, তিনি রেল-স্টিমারে চা খান না, কারণ তাঁহার একটা 'হবি' (hobby) আছে, বাহিরে চা খাইলেই গলা খুস্‌খুস্‌ করে। তবে, বোধ করি ভাত-মাংসতে আপত্তি নাই, কারণ, দেখিলাম বাট্‌লার-কে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার রাইস্‌-কারির ভিজিট কত ?

যাঁহারা জ্ঞানী গুণী ও বিখ্যাত লোক, তাঁহাদের প্রতি ইঁহারা শ্রদ্ধাশীল। এবং শ্রদ্ধাটা একেবারে আকাশচুম্বী,—গগন-ভেদীও বলিতে পারেন। বিচারবুদ্ধি-রহিত হওয়াতেই এই মাত্রাবিপর্য্যয়। এক যাত্রীকে বলিতে শুনিয়াছি, প্রফেসর সত্যেন বসু মহাশয় একখানি পুস্তকের মলাট দেখিয়াই উহার অন্তর্ভুক্ত বিষয়টির আদ্যোপান্ত বলিয়া দিতে পারেন। অন্যেরাও কথাটা মানিয়া লইলেন। না পারিবার কথা কি ? যিনি আইনস্টাইনের ভুল ধরিতে পারেন তাঁহার পক্ষে ইহা তো অতি তুচ্ছ ব্যাপার। বাগ্মিতার কথা উঠিল। একজন বলিলেন, "সে, মশাই, শুনিয়াছি বিপিন পালের বক্তৃতা। কিছুই বুঝিলাম না, কিন্তু যা' শুনিলাম সে এক মহাকাব্য।" এই ধরনের গ্লানিকর প্রশংসা গুণগ্রাহিতার পরিচয় যে নয়, তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। অনুমান করি, বিখ্যাত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে উত্তরকালে যে-সকল রোমহর্ষক কিংবদন্তী সৃষ্টি হয়, তাহার উৎপত্তি এখানেই।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, শিক্ষিত বাঙালি জনসাধারণের সাহিত্য প্রীতি নাই। এই কথাটির একটু সংশোধন আবশ্যক।

ইহাদের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র সম্প্রদায় মাঝে-মাঝে একটু-আধটু সাহিত্য-রচনাও করিয়া থাকেন। এই রচনা সাধারণতঃ দুই প্রকারের, ভ্রমণকাহিনী ও কাব্য-সমালোচনা।

কেহ সপরিবার দার্জ্জিলিং বেড়াইতে গিয়াছিলেন। ফলাও করিয়া সেজবৌদি রানুপিসি ও রাঙাদিদি সম্বলিত এক বিরাট প্রবন্ধে তাহার বর্ণনা বাহির হইল। বিবরণী আরম্ভ হয় বাড়ীর ফটক হইতে। তাহার পর তুচ্ছতম ঘটনাটিও বাদ না দিয়া ভ্রমণকাহিনীর ছলে ভ্রাম্যমান পরিবারটির একটি অবাস্তর চিত্র লিপিবদ্ধ করা হয়। সেজ বৌদির পা মচ্‌কাইয়া যাওয়াতে কী বিভ্রাট ঘটিয়াছিল, রাঙাদিদি তাহার জর্দ্দার কৌটা ফেলিয়া আসাতে কী অনর্থ বাধিয়াছিল, এই জাতীয় তথ্যাদি পূর্ণ একখানি ঘরোয়া রোজনামচা ভ্রমণকাহিনীর নামে বাহির করা হয়। লিখিতে লিখিতে মাঝে-মাঝে বোধ হয় 'ভ্রমণ'-এর কথাটা মনে পড়িয়া যায়, আর তখনই একটি 'প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য'-এর বিবরণ বসাইয়া লেখক বলেন, আমার তখন কবির সেই পংক্তিগুলি মনে হইতে লাগিল,—।এবং বলা বাহুল্য, পংক্তিগুলি যথাযথ উদ্ধৃত হয় না। এই প্রবন্ধে অনেক ছবিও ছাপা হয়। বাতাসিয়া লুপ, টাইগার হিল্ তো বাজারেই কিনিতে পাওয়া যায়। সুতরাং সে-গুলির জন্য হাঙ্গামা নাই। আর যে-কয়টি চিত্র ছাপা হয়, সেগুলি ভ্রাম্যমান পরিবারের অন্তর্গত একজন ফটোগ্রাফারের তোলা। প্রথম ছবি : রানু পিসি—একটি ঝর্ণার সম্মুখে দণ্ডায়মানা; দ্বিতীয় ছবি :

অশ্বপৃষ্ঠে রাঙাদির ছেলে নন্তু ; তৃতীয় আলেখ্য ঃ পর্ব্বতগাত্রে উপবিষ্টা সেজবৌদি ও তাহার ভগ্নী বকুল (লেখকের উৎসাহটা কোথায়, বুঝিতে নিশ্চয়ই বাকী নাই)। প্রবন্ধের শেষ পরিচ্ছেদে সেজবৌদি এণ্ড কোং সহ লেখক আবার বাড়ীর ফটকে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। পৌঁছিয়া তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিতেছেন, আবার সেই শিক, সেই দাঁড়, সেই খাঁচা !

এখন কাব্য-সমালোচনার নমুনা দেখাইয়া এই প্রবন্ধ শেষ করিব। সমালোচনার ধাক্কাটা সাধারণতঃ রবীন্দ্রনাথের উপর দিয়া যায়, সে ভালোই। তিনি বনস্পতি, বারো মাসের তেরোটা ঝড় সামলাইয়া যাইতে পারিয়াছেন। এই সকল রচনার মাথামুণ্ডু বুঝিবার কোনো উপায় নাই। যদি বা বাহির করিতে পারিলেন যে লেখকের মতে রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্য্যের উপাসক, সৌন্দর্য্যের সংজ্ঞাটা কি তাহা আর খুঁজিয়া পাইলেন না। অতঃপর জটিলতা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। যাহা সুন্দর তাহাই সত্য, যাহা সত্য তাহাই নিত্য, এবং যাহা নিত্য তাহাই সাহিত্য ! আপনি একেবারে তলাইয়া গেলেন ! খানিকটা নাকানি-চুবানি খাইয়া যখন আবার ভাসিয়া উঠিয়াছেন, ততক্ষণে সমালোচক ভূমাটুমা পার হইয়া কবিকে লইয়া আসরে নামিয়াছেন। তিনি তখন বলিতেছেন ঃ কবি এই সুন্দর ভুবন ত্যাগ করিয়া মরিতে চাহেন না, তাই তিনি বলিয়াছেন, 'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে'। যদি কথাটা ভালোয়-ভালোয় মানিয়া নেন

তো চুকিয়া গেল। যদি আপত্তি করেন, তাহা হইলে আর রক্ষা নাই। কোথা হইতে যে কতকগুলি অনুস্বার-বিসর্গ-ওয়ালা সিপাই ছুটিয়া আসিবে, আপনি আর পলাইয়া পথ পাইবেন না। বিষম ভয় পাইয়া প্রবন্ধ পাঠে ইস্তফা দিয়া পুস্তক বন্ধ করিবেন।

কিন্তু অলমতি বিস্তরেণ। জন-সাধারণ চোখ রাঙাইতেছেন, টের পাইতেছি।

বালিশের ওয়াড়

সুকুমারবাবুর সহিত বেড়াইতে বাহির হইয়া সেদিন এক মহা ফ্যাসাদে পড়িয়া গেলাম। শহর ছাড়াইয়া ময়দানের দিকে মোড় ফিরিব, এমন সময় সুকুমারবাবু প্রস্তাব করিলেন, সামনের দরজির দোকানটা ঘুরিয়া যাই, সামান্য একটু কাজ আছে, দুই মিনিট দেরি হইবে। বিলক্ষণ, ইহাতে আর কথা কি? সুকুমারবাবু দোকানে ঢুকিলেন, আমি বাহিরে দাঁড়াইয়া সিগারেট ধরাইলাম।

একাদিক্রমে পাঁচটি সিগারেট ধ্বংস হইল। গড়ে এক-একটিতে আট মিনিট লাগিলে প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা। কিন্তু সুকুমারবাবুর ফিরিবার নাম নাই। তিনি দোকানে ঢুকিয়া পকেট হইতে কী-একটা বাহির করিয়া উহা লইয়া খলিফার সহিত সেই-যে বচসা সুরু করিয়াছেন, তাহার আর বিরাম নাই। আমি রাস্তা হইতে দু'জনের মূক অভিনয় দেখিতেছি। সুকুমারবাবু দাঁড়াইয়া, বসিয়া, হেলিয়া, দুলিয়া, ঝুঁকিয়া, রুখিয়া—মনে হইতেছে যেন মহা হাঙ্গামা বাধাইয়া দিয়াছেন, হাত দু'খানি নানা ভঙ্গীতে এবং আঙুলগুলি নানা সঙ্কেতে দ্রুত সঞ্চালিত হইতেছে। ওদিকে খলিফা তাঁহাকে কী-যেন একটা বুঝাইতে চাহিতেছে, কিন্তু সুকুমারবাবুর আনাড়ি বুদ্ধি তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে না পারা-তে সে ক্রমশঃ নিরাশ হইয়া পড়িতেছে।

আরো মিনিট কুড়ি অপেক্ষার পর সুকুমারবাবু অবশেষে

বাহির হইয়া আসিলেন। পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া কপাল মুছিতে মুছিতে বলিলেন, চলুন। আমি ভাবিয়াছিলাম, দুই মিনিটের কিছু বেশি দেরি হওয়াতে উনি বুঝি অজস্র ক্ষমা প্রার্থনা করিবেন। দেখিলাম, তাঁহার চরিত্রে সেরূপ কোনো দুর্ব্বলতা নাই। তা ছাড়া, সময়টা একটা আপেক্ষিক ব্যাপার। যে বাহিরে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করে, তাহার কাছেই অহেতুক ভাবে সময়টা দীর্ঘ বলিয়া মনে হয়। সুতরাং সে-দিক হইতে তাঁহার লজ্জা বোধ করিবার কারণও ছিল না।

পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত ছিলাম, খলিফার সহিত এতক্ষণ ধরিয়া যে-বিষয়ে বাদানুবাদ হইল, তাহার একটা বিবরণ শুনিতে হইবে। বিনা ভূমিকায় উহা আরম্ভও হইয়া গেল। কিন্তু আরম্ভ হইল ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ হইতে,—প্রায় সীবন-শিল্পের জন্মের তারিখ হইতে। মোদ্দা কথাটা এই যে, এক টুকরা পপ্‌লিন দিয়া এক জোড়া বালিশের ওয়াড় তৈরী করিয়া দিবার কথা ছিল। তৈরী হইয়া যাহা আসিল তাহা মাপে ছোট হইল, সেলাই মজবুত না হওয়াতে বালিশে পরাইতে গিয়া উহা খুলিয়া গেল, কাপড়ও খানিকটা চুরি হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ করা যাইতেছে। এইটুকু বক্তব্য। মন্তব্য হইল, অতঃপর এই সকল খলিফা-বেশী তস্করদের সহিত কাহারো কোনো কারবার না করাই ভালো। যত সহজে বলিলাম, তত সহজে শুনি নাই। পপ্‌লিনের টুকরাটি কী ভাবে হঠাৎ একদিন তাঁহাদের সংসারে আসিয়া জুটিল, এই

সূচনা হইতে আরম্ভ হইয়া উপসংহারে খলিফাদের চৌর্য্যবৃত্তি সম্বন্ধে যখন বক্তৃতা চলিতেছে, তখন রাত্রির আহারের সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে।

সে-রাত্রিতে ঘুম ভালো হইল না। স্বপ্ন দেখিলাম, কে যেন আমাকে একটি বালিশের খোলের মধ্যে জোর করিয়া ঠাসিয়া ধরিয়া উহার মুখ সেলাই করিয়া দিতেছে। দম বন্ধ হইবার উপক্রম হইতে বেসুরা চীৎকার করিয়া উঠিলাম। স্ত্রীর ঝাঁকুনিতে ঘুম ভাঙিয়া নিদ্রা-জাগরণের অস্পষ্ট আবেশে কণ্ঠ হইতে নির্গত হইয়া আসিল ঃ পপ্লিন! পপ্লিন!!

আশা করি, সে-রাত্রিতে সুকুমারবাবুর খুব ভালো ঘুম হইয়াছিল। কারণ, তিনি নিজের ঘুমটুকুর উপর আমার ঘুমটুকুও কাড়িয়াছিলেন। আপনারা কিন্তু মনে করিবেন না, সুকুমারবাবুর ব্যবসা-ই হইল অন্যের নিদ্রা অপহরণ করা। সেরূপ বদ অভ্যাস তাঁহার নাই। অনেকে আছেন, সাক্ষাৎমাত্র এমন বক্‌বক্ করিতে আরম্ভ করেন যে শ্রোতা পলাইতে পারিলে বাঁচে। সুকুমারবাবু সে-দলের ন'ন। বরং এক হিসাবে তাহার বিপরীত। তাঁহার বুদ্ধি উজ্জ্বল, বিবেচনা অসামান্য, মেজাজ শান্ত এবং ব্যবহার ভদ্র ও মার্জ্জিত। কিন্তু নিখুঁত চরিত্র পৃথিবীতে নাই বলিয়াই তাঁহার চারিত্রিক পরিমণ্ডল অতখানি স্বচ্ছ হওয়া সত্ত্বেও একটা উৎপাত মাঝে মাঝে ধূমকেতুর মত হঠাৎ আবির্ভূত হইয়া সমস্ত লণ্ডভণ্ড করিয়া দেয়।

আসল কথা, সুকুমারবাবু আত্মপ্রেমে মশগুল। মানুষ

মাত্রেই অবশ্য তাই। তবে, রকমফের এবং মাত্রা-ভেদ আছে। প্রেমিকদের শ্রেণিবিভাগটাই দেখুন না কেন। কেহ কেহ প্রণয়িণী সম্বন্ধে নির্ব্বাক, আত্মহত্যা করিবার পূর্ব্বে জানিবার উপায় নাই, ইহারা হৃদয়-চর্চ্চায় নিযুক্ত। কেহ কেহ অতি-মাত্রায় প্রগল্‌ভ, তাঁহাদের প্রেমের কাহিনী সর্ব্বসাধারণের সম্পত্তি। অপর এক শ্রেণী আছে। তাঁহারা স্বভাবতঃ প্রগল্‌ভ না হইলেও প্রসঙ্গটা কোনো প্রকারে উঠিয়া পড়িলে আর ছাড়াছাড়ি নাই! সুকুমারবাবু এই তৃতীয় শ্রেণীর আত্মপ্রেমিক। নিজের কথায় পঞ্চমুখ নন, চেষ্টা করিয়া কথাটা পাড়িয়া পাঁচ কাহন করিয়া বলিবার অভ্যাসও নাই। কিন্তু যদি বলিলেন, "বাঃ আপনার জুতো জোড়াটি তো বেশ", তাহা হইলে আর রক্ষা নাই। ঘণ্টাখানেক মনের সুখে আপনাকে জুতাইয়া ছাড়িয়া দিবেন। তাঁহার দীর্ঘ বক্তৃতার একটা মোটামুটি চুম্বক কল্পনা করা শক্ত নয়। ধরুন, অনেকটা এই রকম হইবে :

> জুতা কাহাকে বলে—পায়ের চর্ম্মাবরণ মাত্রেই তাঁহার মতে জুতা নহে—জুতা সম্বন্ধে সুকুমারবাবুর পরিবারের ভিন্ন-ভিন্ন ব্যক্তির রুচি-ভেদ—ছাত্র-জীবনে সুকুমারবাবুর জুতার সৌখিনতা (এখন তাহার কিছুই নাই)—সুকুমার-বাবুর জুতার সযত্ন ব্যবহার—তাঁহার দাদার জুতা সম্বন্ধে ঔদাসীন্য এবং তদ্বিষয়ক কয়েকটি মজার গল্প—জুতার ভবিষ্যৎ—সুকুমারবাবুর উপর উহার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া —ইত্যাদি।

প্রসঙ্গ পরিবর্ত্তনের আশায় আপনি হয়তো উপস্থিত কোনো তৃতীয় ব্যক্তিকে বলিলেন, "ভালো কথা, আপনার ছেলেটি কেমন আছে ? জ্বর ছেড়েছে ?" ভদ্রলোক যতক্ষণ পীড়িত পুত্রের অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন, সুকুমারবাবু ততক্ষণ অন্যমনে বসিয়া আছেন। শেষ হইতেই বলিবেন, "জুতো জোড়াটি তাহ'লে আপনার পছন্দ হয়েচে ? এটি সংগ্রহ করতে কি কম সময় গেছে। প্রথমে গেলাম—"

অর্থাৎ আত্মঘটিত আলোচনায় সুকুমারবাবু অতিমাত্রায় উৎসাহী। নিজে উস্কাইয়া তুলিবার অভ্যাস নাই, কিন্তু ঘটনাচক্রে কথাটা ছিট্‌কাইয়া উঠিলে বাগ্‌-বিস্তারে বড় আরাম বোধ করিয়া থাকেন। বলিবার ভঙ্গীটিও সর্ব্বনাশা। মনে হয়, মুখ হইতে একটি অদৃশ্য সূতা ক্রমাগত বাহির হইয়া আপনাকে পাকে পাকে জড়াইতেছে। উহার লঘু বন্ধন প্রথমে মালুম হইবে না। কিন্তু অনতিকাল মধ্যে দেখিবেন, আপনার আর নড়িবার চড়িবার শক্তি নাই, একেবারে ফাঁস আট্‌কাইয়া গিয়াছে। যদি বিশ্বাস না হয়, নিজে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। কালই গিয়া কথাপ্রসঙ্গে সুকুমারবাবুকে বলিয়া দেখিবেন, আপনি চাকরটি নাকি বেশ ভালো পেয়েছেন ? তারপর যদি পাকা দুই ঘণ্টা ভৃত্যকাহিনী না শুনিতে হয়, তাহা হইলে আমাকে নিন্দুক বলিয়া গালাগালি করিয়া যাইবেন। ভৃত্যটি কবে কখন কী উপায়ে সংগৃহীত হইল, তাহা তো শুনিবেন-ই, উপরন্তু যাহা ইঙ্গিতে বুঝিয়া আসিবেন তাহা হইল এই

যে, ভৃত্যের প্রতি তাঁহার ব্যবহারটি সহোদরবৎ বলিয়াই সে-ব্যক্তিটিও একেবারে পরিবারভুক্ত হইয়া গিয়াছে। আমার কিংবা আপনার পরিচারকের প্রতি সেই সাবেকী ভাব অদ্যাপি যায় নাই, তাই আমাদের ভাগ্যে এরূপ চাকরও কোনোদিন জুটিবে না।

এখন প্রশ্ন হইল, স্কুমারবাবুকে লইয়া কী করা যায়? তাঁহাকে দু'কথা শুনাইয়া দিবেন? তাহা কিছুতেই পারিবেন না। তিনি তো দোষী নন। তাঁহার আত্মপ্রসঙ্গ আপনি-ই পাড়িয়াছেন, তিনি পাড়েন নাই। তাঁহার সঙ্গ পরিহার করিবেন? সে-ও অসম্ভব। কারণ, অন্যান্য দিক হইতে তাঁহার বন্ধুত্ব লোভনীয়। সুতরাং স্কুমারবাবুগণ সমাজের এক মহা সমস্যা।

সমস্যাটি জটিল আরো একটি কারণে। স্কুমারবাবু আত্মপ্রেমিক হইলেও অহঙ্কারী নন। সুযোগ হইলে নিজের কথা বলিতে ভালোবাসেন মাত্র, উহাতে নিজের উৎকর্ষ কিংবা শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করিবার চেষ্টা সচরাচর থাকে না। বরং তিনি নিজেকে লইয়া বিদ্রূপ করিতেই অনেক সময়ে বিশেষ ব্যগ্র। সুতরাং তাঁহার প্রতি আপনি স্বভাবতঃই আকৃষ্ট হইবেন, এবং বন্ধুত্ব হইলে নিজেকে সমৃদ্ধ বোধ করিবেন। কিন্তু আত্মবিদ্রূপ যতটুকু স্থায়ী হইলে আমরা উহাকে মাত্রাজ্ঞান কিংবা sense of humour বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি, তাহার বেশি হইলে উহাই আবার গ্লানিকর আত্মপ্রত্যয়ে পরিণত হইয়া পড়ে।

সুকুমারবাবুর আরেকটি দোষ ঐখানে। এটি আগে বুঝিবার উপায় নাই। যেদিন বুঝিবেন, সেদিন বন্ধুত্ব পাকা হইয়া গিয়াছে।

আমি কী উপায়ে এই সমস্যার সমাধান করিয়াছি জানেন? আমি সুকুমারবাবুর সাক্ষাতে ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ বর্জন করিয়া চলি। ঘরোয়া কথা তুলিলেই আত্মপ্রেম আস্কারা পাইয়া বসিবে। তাই রাজনীতি-অর্থনীতি-জাতীয় প্রসঙ্গের মধ্যে আলোচনা আবদ্ধ রাখিতে চেষ্টা করি। অর্থাৎ, তাঁহার মনের বহির্ব্বাটিতে বসিয়া কিছুক্ষণ ধূমপান করিয়া আসি, অন্তঃপুরে প্রবেশ করি না।

সেদিনও বেড়াইতে বাহির হইয়া বহিরঙ্গনেই বিচরণ চলিতেছিল। যুদ্ধ শেষে বম্বে প্ল্যানের সাফল্য কতখানি সম্ভব, তাহারই সুন্দর আলোচনা হইতেছিল। একখানি নৌকা যেন স্বচ্ছন্দ গতিতে তর্‌তর্ করিয়া অগ্রসর হইতেছিল। হঠাৎ কোথা হইতে এক পপ্‌লিনের পাল জুড়িয়া দেওয়া হইল, দম্‌কা বাতাসে নৌকাখানি উল্‌টাইয়া গিয়া হাবুডুবু খাইতে লাগিলাম।

ডাকঘর

একদিন প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইয়া আবিষ্কার করিলাম, পাড়ার পোস্টাফিসটি আমার বাড়ীর অতি নিকটবর্ত্তী একটি গৃহে স্থানান্তরিত হইয়াছে। দেখিয়া আনন্দে উথলিয়া উঠিলাম। হাতের নাগালের মধ্যে একটা গোটা পোস্টাফিস পাওয়া কম সৌভাগ্য নহে। অতঃপর অন্যের ভরসা না করিয়া নিজেই পোস্টাফিসে যাওয়া যাইবে, ডাকপিয়নের অপেক্ষায় না থাকিয়া দু'বেলা চিঠিপত্র আনিতে যাইবারও সুযোগ ঘটিবে, যখন-তখন টিকিট পোস্টকার্ড কিনিবার অবাধ সুবিধাটাই বা কম কি? তাছাড়া, পোস্টমাস্টারের সহিত খাতির করিয়া লইতে পারিলে উহাদের টেলিফোনটাও মাঝে-মাঝে ব্যবহার করা যাইবে। জীবনটা যেন হঠাৎ রীতিমত সহজ ও সমৃদ্ধ হইয়া উঠিল। সরকার বাহাদুরের সুবুদ্ধির প্রশংসা করিতে করিতে বেড়াইয়া বাড়ী ফিরিলাম।

সান্ধ্য আড্ডায় এই শুভ সংবাদটি ঘোষণা করিতে গিয়া বন্ধুমহলে লাঞ্ছিত হইলাম। ডাকঘরটি নাকি বরাবর ঐ স্থানেই ছিল, এবং গত কয়েক বৎসরের মধ্যে উহার স্থান পরিবর্ত্তন হয় নাই। শুনিয়া বিষম লজ্জিত ও তদধিক বিস্মিত হইলাম। পাড়ায় নূতন আগন্তুক হইলেও অন্ততঃ মাস পাঁচ-ছয় যাবৎ এই অঞ্চলে আছি। অথচ—কী আশ্চর্য্য—এত নিকটে এই ডাকঘরটি এতদিন চোখে পড়ে নাই।

বন্ধুগণ বিশ্রীরকম হাসাহাসি করিতে লাগিলেন। আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, ইহা পটলার কারসাজি। পটল আমার ভাগিনেয়। উহাকে একবার পোস্টাফিসে পাঠাইলে ফিরিতে পূরা এক ঘণ্টা। এই কারণেই এ যাবৎ আমার কেমন একটা ধারণা ছিল, ডাকঘরটি নিকটে নহে।

আমি অস্বীকার করিব না যে, আমার দৃষ্টি খুব সজাগ নয়। আমার চোখের খেয়াল সত্যই কিছু কম। অনেক জিনিস দেখা সত্ত্বেও আমার মনের উপর উহার ছবি মুদ্রিত হয় না। ফলে, অনেক কিছুই অদেখা এবং অজানা থাকিয়া যায়। সহরের অপেক্ষাকৃত অপরিচিত অঞ্চলে কোনো ঠিকানায় পৌঁছিতে হইলে হয়তো বা ঘুরিতে ঘুরিতে বহু সন্ধানের পর সেখানে গিয়া পৌঁছিতে পারি। কিন্তু আমি জানি, বাড়ী ফিরিবার সঙ্গে-সঙ্গে নব আবিষ্কৃত সমস্ত পথ ঘাট বেমালুম অস্পষ্ট হইয়া যাইবে, এবং কোন্ রাস্তা ও কোন্ গলি পার হইয়া সেই ঠিকানায় হাজির হইয়াছিলাম, আমার পক্ষে তাহা যথাযথ বর্ণনা করা অসম্ভব হইবে। ইহার কারণ আর কিছু নয়, পথ অতিক্রম করিতে করিতে পারিপার্শ্বিক ছবিটি আমার মনের উপর কোনো রেখাপাত করে না। ভ্রমণের সমগ্র মানচিত্রটিও তাই মনে ফুটাইয়া তুলিতে পারি না।

দু'একটি চক্ষুষ্মান বন্ধুর নিকট এ কারণে আমার লাঞ্ছনার সীমা নাই। তাঁহাদের বীক্ষণশক্তি কিন্তু সত্যই অসাধারণ। তাঁহারা যে-রাস্তায় একবার পা বাড়াইয়াছেন, সে-রাস্তার

নাড়ী-নক্ষত্র আয়ত্ত করিয়া ফেলিয়াছেন; যে-ড্রয়িংরুমে একবার বসিয়াছেন, তাহার আসবাবপত্রের সংখ্যা, আকৃতি গঠন, অবয়ব, বর্ণ, বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি যাবতীয় তথ্য একেবারে নখদর্পনে ফলাইয়া আনিয়াছেন; যে-দোকানে প্রবেশ করিয়াছেন, তাহার পণ্যতালিকা দৃষ্টিপাত মাত্র মুখস্থ হইয়া গিয়াছে। আমি তাঁহাদের এই অলৌকিক দৃষ্টিশক্তিতে আশ্চর্য্য হইয়াছি, এবং তুলনায় নিজেকে চিরকালই অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে করিয়াছি।

দৃষ্টির সচেতনতার অভাবে বিপন্নই কি কম হইয়াছি? হয়তো অত্যন্ত প্রয়োজনের মুহূর্ত্তে অমুক ডাক্তারের বাড়ীটা কোন্ পথে পৌঁছানো যায়, ভাবিয়া পাই নাই; টেলিগ্রাফ আফিসটা যে রমনা পোস্টাফিসেরই এক অংশে অবস্থিত, পূর্ব্বে তাহা খেয়াল না হওয়ায় কোনো জরুরি সংবাদ পাঠাইবার সময় তার-আফিসের সন্ধানে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিয়াছি; কলিকাতায় গিয়া বাসার অনতিদূরে সিটি বুকিং অফিসটা কোনোদিন চোখে না পড়াতে, স্বস্থানে ফিরিবার দিন দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে অনর্থক শিয়ালদহ স্টেশনে টিকিট কিনিতে দৌড়াইয়াছি—অথচ ঐ অফিসটার পাশ দিয়া দৈনিক অন্ততঃ পাঁচ-ছয় বার হাঁটিয়া ফিরিয়াছি। এ সকল কীর্ত্তি শুনিয়া চক্ষুষ্মানগণের হাস্য সম্বরণ করা কঠিন হইবে। তাঁহাদের গোছালো দৃষ্টি সম্পূর্ণ অন্য জাতের। চোখের খেয়াল তাঁহাদের এত তীক্ষ্ণ যে, চতুষ্পার্শ্বের সামান্যতম জিনিসটিরও দৃষ্টি এড়াইয়া যাইবার উপায় নাই।

চোখের ক্যামেরাটি যেখানে পড়িল, মনের পর্দ্দায় তাহার সমগ্র ছবিখানি হুবহু ফুটিয়া রহিল।

অনেকদিন ভাবিয়াছি, আমার এই অস্পষ্ট দৃষ্টির কারণ কী? আমার চোখ খুব খারাপ নয়। এতটা বয়স হইল, এখনো চশমার কাচ বদ্‌লাইতে হয় নাই। সুতরাং সে-পথে ইহার হদিস মিলিবে না। আসল কথা বোধ হয় এই যে, ন্যূনতম প্রয়োজনের অতিরিক্ত চক্ষুর ব্যবহার আমার অভ্যাস নয়। রাস্তায় হাঁটিবার সময় প্রাণ বাঁচাইয়া চলিতে যতটুকু সজাগ দৃষ্টির প্রয়োজন আমার পক্ষে ততটুকুই যথেষ্ট। চেতনার বাকী অংশটা অন্তর্মুখী হইয়া আমাকে অন্য বিষয়ে ব্যাপৃত রাখে। বোধ করি, আমার স্বভাবটাই অন্তর্মুখী। তাই বহির্জগত অপেক্ষা মনোজগতে আমার চেতনা অধিকতর জাগ্রত। লক্ষ্যভেদের সময় অর্জ্জুন যেমন ল্যাজামুড়া বাদ দিয়া মৎস্যের চক্ষুটিকেই কেবল দেখিয়াছিলেন, আমিও তেমন পথ চলিবার সময় গমন অপেক্ষা গন্তব্য সম্বন্ধেই বেশি সচেতন হইয়া থাকি। মনে করুন, কোনো জরুরি কাজে এক ভদ্রলোকের বাড়ী চলিয়াছি। রাস্তায় বাহির হইয়া অর্দ্ধ চক্ষু রাখিলাম মিলিটারি দৈত্যযানগুলির উপর, বাকী দেড় চক্ষু বহির্জগত হইতে বিলুপ্ত হইয়া মনের রাজ্যে দৃষ্টি মেলিয়া বসিল। সেখানে সেই ভদ্রলোকটির সহিত আমার জরুরি প্রসঙ্গটির আলোচনা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে,—তিনি 'এই' বলিতেছেন, আমি 'তাই' বলিতেছি, বাদ-প্রতিবাদের আর অন্ত নাই। রাস্তার দু'ধারে ক'খানি বাড়ী, কয়টি

ইলেকট্রিক থাম, উত্তরে যাইতেছি কি পশ্চিমে যাইতেছি, এই সকল অতি মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করিবার সময়ও নাই, প্রবৃত্তিও নাই। সাক্ষাৎ অন্তে যখন বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম, গৃহিণী হয়তো জিজ্ঞাসা করিলেন:

"গিয়েছিলে ওখানে?"

বলিলাম, "হ্যাঁ"

"কেমন বাড়ী ওদের? দোতলা না একতলা?"

"তা' তো জানি না।'

"ইলেক্‌ট্রিক লাইট আছে? ঘরে বাল্‌ব দেখলে?"

"তা' তো খেয়াল করি নি।"

খেয়াল করিবাব দরকারই বা কি? আমি কি মিউনিসিপ্যালিটির ট্যাক্স ধার্য করিতে গিয়াছিলাম, না, ভদ্র লোকই আমার নিকট বাড়ী বন্ধক দিয়া টাকা ধার করিতে চাহিয়াছিলেন? চক্ষুষ্মানগণ অবশ্য স্ত্রী-মহলে এ বিষয়ে বিশেষ বাহবা পাইতেন। তাহারা বাড়ীর ফটোগ্রাফখানি গৃহিণীদের নিকট একেবারে হুবহু মেলিয়া ধরিতে পারিতেন। তবে, নাকাল হইতেন হয়তো অন্য দিকে। তাঁহারা যে-প্রসঙ্গ আলোচনা করিতে যাইতেন, সম্ভবতঃ তাহাতে বহু ত্রুটি থাকিয়া যাইত। কন্যার বিবাহের প্রস্তাব হইলে দেনাপাওনার কথাটাই মনে থাকিত না, অর্থাৎ স্ত্রীর তাড়নায় বৈকালের দিক আরেকবার ভদ্রলোকের নিকট দৌড়াইতে হইত।

তবে, দৃষ্টিবানের নিন্দা করিব না। হয়তো আমাদের

প্রভেদটাই মৌলিক। তাঁহারা বহির্জগতের অধিবাসী, আমি মনোরাজ্যের বাসিন্দা। 'চিন্তাশীল' বলিয়া তাঁহারা আমাকে পরিহাস করিতে পারেন। কিন্তু আমি যে সর্ব্বদাই বড়-বড় চিন্তা লইয়া অন্যমনস্ক আছি, তাহা নয়। আসলে, অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি যতটা সচেতন, বর্ত্তমান এবং উপস্থিত পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে ততটা নই

আরেকটি কথাও এখানে বলা দরকার। দৃষ্টিশক্তি নির্ভর করে দৃষ্টিকোণের উপর। হয়তো আমার দৃষ্টিকোণ চক্ষুষ্মানের দৃষ্টিকোণ হইতে বিভিন্ন। স্বভাব, শিক্ষা ও রুচি অনুযায়ী একেক জনের দৃষ্টি একেক দিকে। স্ত্রীলোকের দৃষ্টি ও পুরুষের দৃষ্টি সম্পূর্ণ পৃথক। একটি ভদ্রমহিলার সহিত আপনার আলাপ হইল। বাড়ীতে ফিরিয়া বলিতে পারেন, তিনি কী রকম শাড়ি পরিয়াছিলেন, কিংবা তাঁহার কর্ণে স্বর্ণাভরণ ছিল কিনা? আপনি যদি পুরুষ হন, কিছুতেই পারিবেন না—যতই চক্ষুষ্মান হন না কেন। কারণ পুরুষের দৃষ্টি সমগ্র মানুষটির উপর, যেমন স্ত্রীলোকের দৃষ্টি মানুষ ব্যতীত আর সমস্ত কিছুর উপর। ভদ্রমহিলাটি চলিয়া গেলে মেয়ে-মহলে তাঁহার বেশভূষা সম্বন্ধে তুমুল আলোচনা আরম্ভ হইয়া যাইবে। আপনার হয়তো কেবল-মাত্র মনে হইবে, মহিলাটি কথা বলেন ভারী চমৎকার।

যেহেতু ভিন্নরুচির্হি লোকঃ, সেহেতু দৃষ্টিকোণের বিভিন্নতার জন্য কেহ-যে জীবনটা বেশি উপভোগ করিতেছেন

কিংবা কম উপভোগ করিতেছেন, একথা বলা চলে না। আপনি রাস্তার ইলেকট্রিক থাম গুণিয়া খুসী, আপনি জীবন ভরিয়া তাহাই গুণিতে থাকুন, কাহারো কিছু বলিবার নাই। আমি না গুণিয়া খুসি, আমি কোনোদিনই সে হিসাব লইব না। তবে, স্বীকার করুন বা না করুন, একটা কথা বলিব।

চক্ষুষ্মানের জীবন বৈচিত্র্যহীন। তিনি যে চোখের এক দৃষ্টিতে সবই দেখিয়া সারিয়াছেন, কিছুই আর তাঁহার অজানা নাই। কিন্তু আমার মত চক্ষুহীনের নিকট নব-নব আবিষ্কার নব-নব বিস্ময় আনিতেছে, জীবন প্রতিনিয়ত নানাভাবে সমৃদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। ডাকঘরের নৈকট্য অকস্মাৎ একদিন চোখের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইয়া গেল, একযোগে অসংখ্য সুবিধার সম্ভাবনা মনে জাগিয়া উঠিল,—নব-বিবাহিত হইলে এবং বধূ পিত্রালয়ে থাকিলে তো রীতিমত রোমাঞ্চিত হইয়াই উঠিতাম। চক্ষুষ্মানের জীবনে এই বিস্ময় কোথায়? এই পৃথিবীটা তাঁহার মুখস্থ। আবিষ্কারের আনন্দ এবং উত্তেজনা তাঁহার ভাগ্যে নিতান্তই নাই। শিশুগণ যাহা দেখে, তাহাতেই বিস্মিত হয়, পূর্ব্বে এমনটি আর দেখে নাই। আমার মত চক্ষুহীনের কতকটা সেই অবস্থা। এ পৃথিবী তাহার নিকট পুরাতন হইবার নয়। প্রত্যহ নূতন কোনো জিনিস চোখে পড়িতেছে যাহা পূর্ব্বে কোনোদিন লক্ষ্য হয় নাই—নূতন কোনো সাংসারিক সুবিধা, নূতন কোনো অভিজ্ঞতা, নূতন কোনো দৃশ্য। চক্ষুষ্মান ব্যক্তি দেখিয়া

শুনিয়া, সুবিধা বাড়াইয়া, অসুবিধা দূর করিয়া আমার বহু পূর্ব্ব হইতেই জীবনটা উচ্চগ্রামে বাঁধিয়াছেন, সন্দেহ নাই। তিনি নিকটের ডাইং-ক্লিনিং হইতে কাপড় ধোয়াইয়া ধোপদোরস্ত কাপড় পরিতেছেন। আমি তাঁহার প্রতিবেশী হইয়াও সে দোকানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অচেতন। তিনি পাড়ার অনতিদূরে ছোট্ট একখানি সুন্দর ময়দানের সন্ধান জানেন, সেখানে রোজ সন্ধ্যায় তিনি হাওয়া খাইয়া আসেন। আমার তাহা দেখিয়াও কোনোদিন খেয়াল হয় নাই। বাড়ীতে বসিয়া হাপাইয়া মরি।

কিন্তু মনে করুন, যেদিন হঠাৎ আবিষ্কার করিব, বাড়ীর নিকটে একটি ধোপাবাড়ীর দোকান আছে, সেদিন জীবনে মহাসমারোহে যে শুভ্রতার প্লাবন আসিবে, নিয়মিত ধোপদোরস্ত জীবনে তাহার তুলনা কোথায়? কিংবা, যেদিন সেই তৃণাচ্ছাদিত পরিচ্ছন্ন প্রান্তরখানি দিগন্তের স্বর্ণরেখাসহ অকস্মাৎ মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় জীবন-গগনে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে, সেদিনকার সেই বিচিত্র বিস্ময়ের তুলনায় পরিচিত ময়দানটিতে অভ্যস্ত পদচারণার মূল্য কতটুকু?

বড়লোক

বড়লোকের সহিত দেখা করিতে হইলে প্রার্থীরূপে যাওয়াই প্রশস্ত। পদগৌরবে এবং অর্থসম্পদে যিনি আপনার উচ্চে, তিনি নিশ্চয়ই আপনার সহিত ইয়ার্কি মারিবার জন্য জন্মগ্রহণ করেন নাই। সুতরাং আপনারও তাঁহাকে সমকক্ষ ভাবিবার কোনো পার্থিব অধিকার নাই। মনে করুন, কোনো একটা চাকুরির চেষ্টায় আছেন। শুনিতে পাইলেন, মিঃ অমুক যদি মিঃ তমুকের নিকট আপনার জন্য সুপারিশ করেন, তাহা হইলে কাজটা না হইয়া যায় না। মিঃ অমুক অবশ্যই একজন বড়লোক। এক্ষেত্রে তাঁহার সহিত আপনার সাক্ষাৎ করাটা ব্যক্তিগত স্বার্থের দিক দিয়া যেমন প্রয়োজনীয়, সমাজব্যবস্থার দিক হইতে আবার তেমনই অপরিহার্য কর্ত্তব্য। তাঁহার নিকট প্রার্থী হইয়া না যাইতে চান তো চাকরির আশা ছাড়িতে হয়।

অবশ্য দেখা করিতে চাহিলেই দেখা হয় না। কারণ, বড়লোকের সময় কম এবং দায়িত্ব বহু। এন্‌গেজ্‌মেণ্ট করিয়া যাইবারও উপায় নাই, কারণ, উহাতে প্রার্থনার মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়, তাগিদও কম বলিয়া বোধ হয়। তাছাড়া, চিঠির জবাব যদি ভাগ্যক্রমে পান-ও, একটা ঝুঁকি থাকিয়া যায়, কী জানি হয়তো উত্তর আসিবে, আগামী সাত দিনের

মধ্যে তাঁহার ফুরসং নাই। সুতরাং সহজ পন্থাটি হইল, ছাতিটি মাথায় দিয়া বাহির হইয়া পড়া। পূর্ব্ব দিবস রাত্রে আহারাদির পর দাড়ি কামাইবার ব্লেডটিকে কাচের গেলাসে ঘষিয়া রাখিয়া দিবেন এবং প্রত্যূষে উঠিয়াই বেশভূষা সমাধা করিয়া অভীষ্ট তীর্থ অভিমুখে যাত্রা করিবেন। রিক্‌শ বোধ হয় জুটিবে না। জুটিলেও আট আনার কমে যাইবে না। সুতরাং রোদ চড়িবার আগে ঠাণ্ডায়-ঠাণ্ডায় চলিয়া যাওয়াই ভালো।

মিঃ অমুকের বাড়ীতে পৌঁছিয়া অতি সন্তর্পণে ফটক খুলিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবেন এবং পুনরায় প্রবেশদ্বার অর্গলবদ্ধ করিবেন। ফটক খুলিতে গিয়া শব্দ হইলেই কিন্তু সব মাটি। কারণ শব্দে আকৃষ্ট হইয়া দ্বিতলের কোনো গুপ্ত গবাক্ষ হইতে যদি মিঃ অমুক আপনাকে দেখিয়া ফেলেন, তাহা হইলে আর ভেট মিলিবে না।

বাগানে একটি মালি কাজ করিতে থাকিবে। অন্য কোনো জনমানবের সাড়াশব্দ না পাইয়া আপনি স্বভাবতই সাহেব সম্বন্ধে তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করিতে ইচ্ছা করিবেন। কিন্তু সে প্রথমত আপনার কথায় কর্ণপাতই করিবে না। খুরপি সাহায্যে অন্যমনে ফুলগাছের পরিচর্যায় প্রবৃত্ত থাকিবে। কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে আপনাকে অসহায় অবস্থায় দণ্ডায়মান দেখিয়া কৃপাকণ্ঠে বলবে: উ ধারে যান, চাপ্রাসি আছে। "উধার"টা অবশ্যই দিক্‌জ্ঞানের সহায়ক হইবে না। তবে, এটুকু উপলব্ধি হইবে যে

নিজের চেষ্টা আপনার নিজেরই দেখিতে হইবে। বড়লোকদের সঙ্গে যাঁহারাই দেখা করিতে গিয়াছেন, তাঁহারাই বলেন, সাক্ষাৎকারের এই পর্বটি অত্যন্ত ক্লান্তিকর এবং বিরক্তিজনক। অনেক দুর্বলচেতা সাক্ষাৎকামী এই লছমনঝোলা পর্য্যন্ত আসিয়া আর অগ্রসর হইতে না পারিয়া বাড়ী ফিরিয়া যান। জীবনে তাঁহাদের কোনো উন্নতিও হয় না। পরন্তু যাঁহারা দৃঢ়সঙ্কল্প, তাঁহারা উদ্যান-পরিচারকের সাহায্যের আশা ত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ অট্টালিকার চতুষ্পার্শ্বে উঁকিঝুঁকি মারিতে থাকেন। সাধারণত ঘণ্টা দুয়েক এই প্রকার অনুসন্ধানী দৃষ্টিক্ষেপ করিবার অনতিপর চাপরাশির দেখা পাওয়া যায়। আমি একজন ভদ্রলোককে জানি, তাঁহাকে দেড়ঘণ্টা মাত্র উঁকিঝুঁকি মারিতে হইয়াছিল। উঁকির সঙ্গে ঝুঁকিটা কিসের জানেন তো? ঝুঁকিটা হইল (বাঙালি সাহেবের বাড়ী হইলে) উঁকি মারিতে গিয়া অন্দর মহলের সঙ্গে হঠাৎ চাক্ষুষ যোগাযোগ ঘটিয়া যাওয়া। তাহা হইলে কিন্তু আর রক্ষা নাই। সাক্ষাতের আশা সেখানেই খতম। আপনি হয়তো বলিবেন, কেন, তা'তে তো আরো সুবিধা হওয়ার কথা, একজন সাক্ষাৎকামী যে বাহিরে প্রতীক্ষারত, সে-খবরটি আরো শীঘ্র যথাস্থানে পৌঁছিবে। আমি বলিব, তাহা হইলে আপনি বড়লোকের অন্দরের খবর থোড়াই রাখেন। বড়লোকের বাড়ীর নিয়মই হইল, বাহিরে যখন বহু লোক সাক্ষাতের কামনায় অপেক্ষমান, সাহেব তখন পরম নিরুদ্বেগে দ্বিতলের এক

প্রকোষ্ঠে বসিয়া ছুরির সাহায্যে বাম বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের নখর উৎপাটনে নিযুক্ত। এ-দৃশ্যটি অন্দর-মহলের বাসিন্দারাই বেশি উপভোগ করিয়া থাকেন এবং সেই কারণেই উকিব ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ঝুঁকিটা অত্যন্ত ভয়ানক।

চাপরাশির দেখা হয়তো ভাগ্যক্রমে পাওয়া যাইবে। আপনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিবেন, "সাহেব বাড়ীতে আছেন?" সে বলিবে, "হাঁ, লেকিন দেখা হোবে কিনা বলতে পারবে না।" যাহারা চাপরাশি জাতি সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ, তাহারা সাধারণত এই উক্তিতে অত্যন্ত ঘাবড়াইয়া যান। তাঁহাদের অবগতির জন্য বলি, চাপরাশিরা কোনো সাক্ষাৎকামীকে দেখা মাত্র তাহার আর্থিক অবস্থা, পদমর্য্যাদা এবং সাহেবের সঙ্গে পরিচয়ের সম্ভাব্য গভীরতা সম্বন্ধে একটা মোটামুটি আন্দাজ করিয়া লইতে পারে। যেখানে এই তিন পর্য্যায়েই আগন্তুকের নম্বর পাশ-মার্কার নিচে, সেখানেই চাপরাশিগণ ঐ প্রকার হৃদয়বিদারক উত্তর দিয়া থাকে। তখন মুষড়াইয়া না পড়িয়া স্মার্টভাবে বলিতে হয়, "একটু খবর দাও না।" আপনার সপ্রতিভতায় চাপরাশির মনে সংশয়ের উদয় হয়, বুঝি-বা আপনার সম্বন্ধে তাহার অনুমান কোনো-এক পর্য্যায়ে ঠিক হয় নাই। নির্বোধের মত বলিয়া ফেলে, "কার্ড দিন।" আপনার অবশ্যই কার্ড নাই, এবং একখানি কাগজে নাম লিখিয়া আনিতেও মনে নাই। সুতরাং ইতস্তত করিয়া উহাকেই আবার এক টুকরা কাগজ ও পেন্সিলের জন্য অনুরোধ করিতে হয়।

কোনো-কোনো বড়লোকের বাড়ীতে এই কাজের জন্য ছোট-ছোট কাগজের টুকরা একত্র গ্রথিত হইয়া দেয়ালে একটি পেন্সিলসহ ঝোলানো থাকে। পেন্সিলটি অর্ধাঙ্গুষ্ঠ পরিমিত এবং শিসটি প্রায়ই লুপ্তপ্রায়। উহারই সাহায্যে কোনো প্রকারে নামজারি সাঙ্গ করিয়া চাপরাশির নির্দেশমত একখানি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে অপেক্ষা করিতে হয়। এই প্রকোষ্ঠটিতে সাধারণত কোনো দামি আসবাবপত্র থাকে না। সাহেবের প্রথম জীবনের স্মৃতিচিহ্ন গোটাকয়েক জীর্ণ চেয়ার টেবিল এই প্রকোষ্ঠে রক্ষিত হইয়া থাকে। প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকাটা খুব সুখকর নয়, কিন্তু তাহাতে বিরক্ত না হইয়া ধৈর্যধারণ করিয়া থাকাই সঙ্গত। যদি ধূমপানের অভ্যাস থাকে, তাহলে তো কথাই নাই। সিগারেটটি ধরাইয়া মনে-মনে আসন্ন ইন্টারভিয়ু-র দু' একবার মহড়াও দিয়া লইতে পারিবেন।

অপেক্ষার মেয়াদ সাধারণত এক ঘণ্টা। ইহার বেশি বড়-একটা হয় না,—যদি না ঘণ্টাটি অতিবাহিত হইবার সঙ্গে-সঙ্গে আপনার সাহেবের বাড়ীতে অন্য এক সাহেব মোটরযোগে 'কল' দিতে আসিয়া পড়েন। এ-রকম দুর্ঘটনা আমার জীবনে দু'একবার ঘটিয়াছে। তবে, বড়লোকেরা সাধারণত সকালবেলায় লৌকিকতায় বাহির হন না। যোগাযোগের বিশেষ প্রয়োজন হইলে টেলিফোনযন্ত্রে কার্য্য সমাধা করেন। সুতরাং অপেক্ষার মেয়াদ মোটামুটি এক ঘণ্টা-ই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। এই এক ঘণ্টা অবশ্যই

নিরুপদ্রবে যাইবে না। ক্রমে-ক্রমে নানারকম উৎপাত সহ্য করিতে হইবে। দু' একটি নমুনা জানাইয়া দিলে পূর্বাহ্ণে সাবধান হইতে পারিবেন।

প্রতীক্ষাগারটি প্রায়ই সাহেবের (বাঙালি হইলে) পুত্রকন্যাদের খেলার ঘর স্বরূপ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সেটি আগে বুঝিবার উপায় নাই। হয় তো সিগারেটে টান দিয়া পরম তৃপ্তিসহকারে পায়ের উপর পা তুলিয়া উদ্ধতন চরণকমলটিকে ঈষৎ আন্দোলিত করিতে-করিতে ভবিষ্যৎ জীবনের সুখস্বপ্ন দেখিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ মর্মভেদী চীৎকারে চমকাইয়া উঠিয়া বিস্ফারিত নয়নে আবিষ্কার করিলেন, আপনার চেয়ারের নিচে এবং এইরূপ অন্যান্য চেয়ারের তলদেশে একটি করিয়া মানবক গুঁটিশুঁটি মারিয়া উপবিষ্ট। তাহারা লুকোচুরি খেলিতেছে। "চোর" জানালা বাহিয়া কক্ষমধ্যে প্রবেশ করাতে কৌতুক চরমে উঠিয়া ফাটিয়া পড়িয়াছে। এ অবস্থায় আপনার অবশ্য কিছুই করিবার নাই। কেবল পুনরুপবেশনপূর্বক চিন্তা করিতে পারেন, ইহারা আসিল কোথা হইতে? আরেক রকম উৎপাত হইল, সাক্ষাতের প্রার্থনায় প্রতিদ্বন্দ্বীর আবির্ভাব। ইনি আসিয়াই প্রশ্ন করিবেন, সাহেবকে খবর দেয়া হয়েছে? যেন তাঁহার সুবিধার জন্য খবর দিয়া রাখাটা আপনারই কর্তব্য। আগন্তুক প্রথমত একটু অধৈর্য্য প্রদর্শনপূর্বক "চাপরাশি, চাপরাশি" বলিয়া হাঁকডাক ছাড়িবেন। ভাবখানা, তিনি হইলেন উচ্চতর স্তরের জীব,

ইণ্টারভিউর জন্য আসিলে কী হইবে অর্থাৎ আপনার মত গোবেচারী ভাবে বসিয়া থাকা তাঁহার অন্তত পোষাইবে না। কিন্তু বড়লোকের বাড়ীর চাপরাশিরা এ-বিষয়ে পূরো ডেমোক্র্যাট। কিছুক্ষণ পর দেখিবেন, আগন্তুক আপনার মতই চেয়ারে উপবেশন করিয়াছেন এবং আপনার মতই ক্রমশ নির্জীব হইয়া পড়িতেছেন।

হঠাৎ এক সময়ে সিঁড়িতে পদশব্দ শোনা যাইবে, এবং আপনি সচকিত হইয়া উঠিবেন। আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী আপনার পরে আসিয়াও প্রথমে সাক্ষাৎলাভের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকিবেন। আপনি যদি অভিজ্ঞ ব্যক্তি হন, তাহা হইলে পদশব্দ শোনামাত্র বুঝিবেন, উহা সাহেবের নয়, মেমসাহেবের। তিনি কয়েকখানি চিঠি ডাকে পাঠাইবার জন্য চাপরাশির সন্ধানে নিচে নামিতেছেন। কিন্তু অনভিজ্ঞ হইলে সিকিদগ্ধ সিগারেটটি অকালে ফেলিয়া দিবেন এবং ব্যর্থমনোরথ হইয়া পুনরায় অপেক্ষাসমুদ্রে নিমজ্জিত হইবেন। সিঁড়িতে এইরূপ বহুবার পদশব্দ হইতে থাকিবে, এবং অবশেষে একবার স্বয়ং সাহেবই আফিসকক্ষে অবতরণ করিবেন। যদি ভাগ্যবান হন, সর্বপ্রথমে আপনার ডাক পড়িবে। সাহেব ইংরেজ হইলে আলাপ অবশ্যই ইংরিজিতে হইবে। যে সব উৎকৃষ্ট ফ্রেজ এবং ইডিয়ম তৈরি করিয়া আসিবেন, তাহার কোনোটিই কাজে লাগিবে না, কারণ বাড়ীতে রিহার্সালের সময় অপর পক্ষের অনুপস্থিতিনিবন্ধন উপযুক্ত প্রশ্নগুলি এড়াইয়া সাহেব সম্পূর্ণ অন্য প্রকারের

প্রশ্নাদি করিবেন। সাহেব যদি বাঙালি হন, তাহা হইলেও অন্তত আপনার দিক হইতে কথোপকথনটা ইংরেজিতে আরম্ভ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ঘরে ঢুকিয়া বিনীতভাবে অভিবাদন করিয়া দাঁড়াইবেন। অভিবাদনের নানা ভঙ্গী আছে। যুক্ত হস্তে নমস্কার করিতে পারেন, মৃদু সঞ্চালনে দেহের শীর্ষদেশ আনত করিয়া পারেন, দক্ষিণ মুষ্টি ঈষদবনমিত নাসিকার শিখরদেশে ঠেকাইতে পারেন, অথবা ঋজুভাবে দাঁড়াইয়া দক্ষিণ হস্তের তর্জনী হইতে কনিষ্ঠা এই চার আঙুল শ্রেণিবদ্ধ এবং সুবিন্যস্ত করিয়া তৎসাহায্যে কপালের দক্ষিণ পার্শ্ব মৃদুভাবে স্পর্শ করিতে পারেন। সাহেব অস্ফুট স্বরে কী-একটা বলিবেন, তাহা বোঝা যাইবে না। আপনার ধারণা হইবে, তিনি আপনার আগমনের উদ্দেশ্য জানিতে চাহিতেছেন। আপনি অগ্রসর হইয়া আসিয়া আপনার প্রার্থনা নিবেদন করিবেন, এবং পরিচয়পত্রাদি যাহা সঙ্গে আনিয়াছেন, টেবিলের উপর রাখিবেন। সাহেব দু'একখানি উঠাইয়া লইয়া পড়িতে থাকিবেন। যেটিতে আপনার অতুলনীয় প্রতিভা, কর্মক্ষমতা এবং চরিত্রের নিষ্কলুষতা সম্বন্ধে উচ্চতম প্রশংসা আছে, সেখানি পাঠ করিবার পরম মুহূর্তে টেবিলের উপর টেলিফোন বাজিয়া উঠিবে এবং সেই দূরবর্তী পাষণ্ডের সহিত কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইয়া সাহেব সেই প্রশংসাপত্রটির প্রতি সম্যক মনোনিবেশ করিতে পারিবেন না। আপনি জানাইবেন, আপনার দরখাস্ত পেশ করা হইয়া গিয়াছে, এখন

সাহেবের—! কথাটা সম্পূর্ণ না-করাই ভালো। কাকুতির উহাই হইল প্রকৃষ্টতম ব্যঞ্জনা। সাহেব জিজ্ঞাসা করিবেন, চাকরির বেতন কত? আপনি বলিবেন, একশো টাকা। সাহেব ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অনুকম্পার স্বরে বলিবেন, "Why, you deserve more!" আপনি একেবারে বিগলিত হইয়া পড়িবেন, এবং অপ্রত্যাশিতভাবে এতটা সহানুভূতি পাইয়া আরো দু'চার কথা নিবেদন করিতে উদ্যত হইতেই সাহেব ঘণ্টা বাজাইবেন এবং চাপরাশি আসিলে দ্বিতীয় ব্যক্তিকে ভেজিতে আদেশ দিবেন।

মিঃ অমুক আপনার জন্য মিঃ তমুকের কাছে অবশ্যই সুপারিশ করিবেন। কিন্তু চাকরি হইবে না। অবশ্য তাহাতে কিছুই আসে যায় না। বরং একটি বড়লোকের সঙ্গে পরিচয় হইয়া রহিল তো। অতঃপর অন্য-কোথাও দরখাস্ত দিতে হইলে 'রেফারেন্স' হিসাবে তাঁহার নামটা যে উল্লেখ করিতে পারিবেন, তাহার মূল্যই বা কম কী?

মিথ্যাবাদী বালক

সহজ কথাগুলিকে পণ্ডিতেরা এত জটিল করিয়া তোলেন কেন, বলিতে পারেন? সত্য-মিথ্যার সাধারণ প্রসঙ্গটাই ধরুন না কেন। যে মিথ্যা কথা বলে, সে মিথ্যাবাদী। মিথ্যা কি? যাহা সত্য নয়, তাহাই মিথ্যা। কিন্তু সত্য কি? এবারেই ঠেকিলেন। আপনিও ঠেকিলেন, পণ্ডিতদের পাণ্ডিত্যও আরম্ভ হইল। শুনিয়াছি, সেকালে এক রহস্য পরায়ণের মুখে এ প্রশ্নটি পূর্ব্বেও একবার উত্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রশ্ন করিয়াই প্রস্থান, ভদ্রলোক উত্তরের অপেক্ষা করেন নাই। আচরণটা ভদ্রোচিত নিশ্চয়ই হয় নাই। আর কিছুদিন বাঁচিয়া থাকিতে রাজি হইলেই রবীন্দ্রনাথ ও আইনস্টাইনকে ধরিয়া একটা বিহিত করিয়া দেওয়া যাইত।

কিন্তু দৈনন্দিন জীবন লইয়া যেখানে কারবার, সেখানে অতখানি অভ্রভেদী তত্ত্বতালাসের দরকার নাই। সেখানে সত্য-মিথ্যার অর্থ অতিশয় সুস্পষ্ট। বালক মাত্রেই জানে, কাচের গ্লাসটি ভাঙিয়া স্বীকার করিলে সত্য কথা বলা হয়, অস্বীকার করিলে মিথ্যা বলা হয়। অর্থাৎ নিজের লাভ-ক্ষতি কিংবা নিন্দা-প্রশংসা নির্ব্বিশেষে কোন জ্ঞাত বিষয় যথাযথ প্রকাশ করা সত্যাচরণ। আর ক্ষতি এড়াইবার জন্য, দোষ ঢাকিবার জন্য, অথবা স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে উহা লুকাইয়া ফেলা কিংবা আংশিকভাবে প্রকাশ করা মিথ্যাচরণ। দর্শনের

অলৌকিক রাজ্যের বাহিরে সত্য-মিথ্যার এই সংজ্ঞাই যথেষ্ট।

মিথ্যাবাদী বালককে সকলেই নিন্দা করে, এবং দেখিতেছি, নিন্দাটা যেন কায়েমী হইতেই চলিল। কিন্তু আমার মনে হয়, কথাটি একটু নূতন করিয়া ভাবিয়া দেখিবার সময় হইয়াছে। আত্মরক্ষার প্রথম ও আদিমতম অস্ত্র হইল মিথ্যা বলা। যে বালক বেগতিকে পড়িয়াও মিথ্যা বলিতে পারে না, তাহার সম্বন্ধে চিন্তিত হইবার কারণ আছে। তাহার আত্মরক্ষার সহজ প্রবৃত্তিটি সম্যক পরিস্ফুট হয় নাই, নিজের ভালমন্দ বিচার করিবার জ্ঞান হয় নাই, কল্পনাশক্তিও দুর্ব্বল। অপর পক্ষে, যে বালক দুষ্কর্ম্ম বেমালুম অস্বীকার করে, তাহার কুকর্ম্ম-সুকর্ম্ম সম্বন্ধে জ্ঞান হইয়াছে, কুকর্ম্মটা স্বীকার করিয়া লইলে সম্ভাব্য লাঞ্ছনা সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ সচেতন। কেবল তাহাই নহে, অপরাধটা সম্পূর্ণ কবুল না করিয়া যেটুকু ঘটনার হেরফের ঘটাইলে অব্যাহতি পাইলেও পাওয়া যাইতে পারে, সেটুকু বানাইয়া বলিবার মত কল্পনাশক্তি তাহার আছে। মিথ্যা বানাইয়া বলা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। একাধারে বুদ্ধিমান, সপ্রতিভ এবং প্রত্যুৎপন্নমতি না হইলে বানাইয়া বলিবার ক্ষমতা থাকিতে পারে না। আপনার ছেলেটি সত্যবাদী বলিয়া আপনি গর্ব্বিত হইতে পারেন, আমি কিন্তু শুনিয়া দুঃখিতই হইব। আমার ছেলেটির মত উহার বানাইয়া বলিবার ক্ষমতা নাই। তাই ধরিতে আসিলেই ধরা পড়িয়া যায়। আপনি বলিবেন, পড়িবেই

তো, ও যে সত্যবাদী। আমি উহার আত্মরক্ষার অক্ষমতাকে বাহবা দিতে রাজি নই। এই কল্পনাশক্তিরহিত বালকরাই ধরা পড়িয়া সত্যবাদী নামে বিখ্যাত হয়। ফলে, যে সকল নিষিদ্ধ কার্য্যের সমষ্টিকে আমরা বাল্যকাল বলিয়া থাকি, সেই সকল অতি-উত্তেজনাময় অনাচারগুলি তাহাদের অভিজ্ঞতার বহির্ভূত থাকিয়া যায়। মিথ্যা বলিতে পারিলে নিষ্কৃতি পাইবার একটা ভরসা থাকে, এবং সেই ভরসাতেই বিধিবহির্ভূত যাবতীয় দুষ্কর্ম্ম করিবার সংসাহস জন্মায়। জর্জ ওয়াশিংটন নাকি বলিয়া ফেলিয়াছিলেন, পিতঃ, আমিই এই বৃক্ষ ছেদন করিয়াছি। ইহা সত্য বলিয়া আমার মনে হয় না। যে-বালক উত্তরকালে এত বড় একটা লোক হইয়াছিল, তাহার পক্ষে এই মূঢ়তা অবিশ্বাস্য। কুঠার হাতে পাইয়া যে বৃক্ষ ছেদন না করে কিংবা ছেদন করিয়া সেই দুষ্কর্ম্ম অস্বীকার না করে, সে-বালকের চিকিৎসার প্রয়োজন আছে।

ঘটনার অপলাপকে যদি মিথ্যাচরণ বলিতে হয়, তাহা হইলে অনেক ক্ষেত্রে অবিচারের সম্ভাবনা আছে। কারণ, ঘটনা অনেক সময়ে অবান্তর। উহা হইতে কিছুই প্রমাণ না-ও হইতে পারে। 'গল্পগুচ্ছ'র সেই যাত্রাদলের বালক কিরণময়ীর আশ্রিত নীলকান্তকে মনে পড়ে? সে তো সতীশের দোয়াতদানটি চুরি করিয়াছিল, তাহার বাক্স হইতে উহা পাওয়াও গিয়াছিল। কিন্তু সে তো চোর নয়। সে চুরি করিয়াছিল, তবু সে চোর নয়। কিরণময়ী তাহা বুঝিয়াছিলেন। তাই বাক্সটি ঘরে আনাইয়া দোয়াতটি বাহির

করিয়া গোপনে গঙ্গার জলে ফেলিয়া আসিলেন। নীলকান্ত যদি বলিত, সে চুরি করে নাই, কিছুমাত্র মিথ্যাচার হইত না।

খাঁটি কথাটি জানিতে হইলে কেবল কতকগুলি আনুষঙ্গিক ঘটনা পরীক্ষা করিলে চলে না। এক লেখক রহস্য করিয়া 'সত্য'কে তুলনা করিয়াছেন চটের বস্তার সঙ্গে। উহা ঘটনা-বোঝাই না হইলে দাঁড়াইতে পারে না। এই তুলনা অনেক ক্ষেত্রে অসার্থক। মাঝে-মাঝে এক-একটি লোক দেখা যায়, তাঁহারা না জানেন এমন কোনো তথ্য, এমন কোনো ঘটনা পৃথিবীতে নাই। ঘটনাগুলি যেন তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিয়া ঘটে। এক-একজন এক-একটি ঘটনা-বিশারদ —লক্ষ খবরের মালিক। কিন্তু ইহাদের নিকট কোনো বিষয়ের উপর একটি সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত প্রার্থনা করুন, হতাশ হইবেন। কারণ, যে রসায়নে ঘটনার পাকে আসল জিনিসটি বাহির হইয়া আসিতে পারে, সেটি তাঁহাদের আয়ত্ত নয়।

আপনি বলিতে পারেন, ঘটনার বিচার এক জিনিস, আর ঘটনা গোপন করা অন্য জিনিস। নীলকান্ত না হয় চুরি করিবার উদ্দেশ্যে দোয়াতদানটি বাক্সের মধ্যে রাখে নাই, কিন্তু সে যদি দোয়াতের অবস্থান সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞতার ভান করে, তাহা হইলে কি বলিব? কিছুই বলিবার নাই। উহা হইতে যাহা প্রমাণিত হইতে পারে, তাহা মিথ্যা। সুতরাং এ ঘটনাও অর্থহীন। আসল কথা, বিচারবুদ্ধি জন্মিলে সমাজের যে সকল বিধি-নিষেধ আমাদের আর অসঙ্গত বোধ হয় না এবং আমরা সহজে মানিয়া চলি,

বালক-বয়সে সেগুলিকে জুলুম বলিয়া মনে হয়, এবং বালকের দুষ্কর্ম্মগুলি সেই সব বন্ধনচ্ছেদন-অভিযানের জয়চিহ্ন মাত্র। অর্থাৎ, অপরিণত বয়সের দুষ্কৃতিগুলি দুশ্চরিত্রতার লক্ষণ নয়। উহারা নিজেরাও বোধকরি তাহা কিছু কিছু জানে, তাই অবিচারের আশঙ্কায় কোনো কোনো সময়ে ঘটনা গোপন করে, কখনো বানাইয়া বলে।

বানাইয়া বলিবার ক্ষমতা সাহিত্যিকদের নিকট অন্তত দোষনীয় বলিয়া মনে হইবে না, আশা করি। যাঁহারা সাহিত্যানুরাগী, তাঁহারাও এ অভ্যাস অনুমোদন করিবেন, ভরসা করা যায়। যিনি যত বানাইয়া বলিতে ওস্তাদ, তিনি তত শক্তিমান লেখক। রসজ্ঞানহীন ঐতিহাসিক হয়তো কথাটা মানিবেন না, তিনি 'আনন্দমঠে অনৈতিহাসিকতা' খুঁজিয়া বেড়াইবেন, মন্বন্তরের সন তারিখ লইয়া রসিক-সমাজে একটা হৈ-চৈ তুলিয়া বসিবেন। লিটন ষ্ট্রাচির সহিত তো তাঁহার মহা তর্কই বাধিয়া যাইবে ; কারণ লিটন ষ্ট্রাচি বলেন, কাহারও জীবনী লিখিতে বসিয়া যদি মনে হয়, লোকটির বাঁ পা-টি খোঁড়া হইলে মানাইত ভাল, তাহা হইলে আর দ্বিধা না করিয়া কলমের খোঁচায় তাহার বাম পদটিকে জখম করিয়া দেওয়া উচিত।

সকল বালকের কল্পনাশক্তি এক নয়। তাই বানাইয়া বলিবার ক্ষমতাও তাহাদের সমপর্য্যায়ের নয়। অনেক ছোট ছোট ছেলেমেয়ে গল্প লেখে। যাহাদের কল্পনা সীমাবদ্ধ

তাহারা পারিপার্শ্বিক কিংবা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছাড়াইয়া যাইতে পারে না। একটি মেয়ে গল্প লিখিয়াছিল—

> একজন বাবা ছিল। সে রোজ ভাইকে কোলে
> নিয়ে বেড়াতে যেতে। আমি তখন যেতাম না।
> আমি আজ বিকেলে বেড়াতে যাবো। কিন্তু আজ
> বোধহয় বিষ্টি পড়িবে।

একই বয়সের অন্য একটি মেয়ে 'শূন্য খাঁচা' নাম দিয়া এক পলাতকা পক্ষিণীর কাহিনী বর্ণনা করিয়াছিল। তাহাদের বাড়ীতে কোনো খাঁচায়-পোষা পাখি ছিল না। সুতরাং, তাহার কল্পনা সেই পক্ষিণীর সহিত আরো একটু ঊর্দ্ধে উড্ডান হইয়াছিল, বলিতে হইবে।

কিন্তু মাঝে-মাঝে দুই-একটি অতি শক্তিমান বালক দেখা যায়, তাহারা কুকার্য্য ঢাকিবার জন্য এমন সুন্দর গল্প তৈরী করিয়া বলিতে পারে যে, বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ থাকে না। দৈবাৎ উহার অসত্যতা আবিষ্কৃত হইলে বালকটির উপর রাগ করিবেন কি, উহার উপায়-নৈপুণ্য, কল্পনাকুশলতা এবং কল্পিত ঘটনার সুকৌশলী পারম্পর্য্য-সৃষ্টির অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিবেন। এমন কি, ভাবিয়া আনন্দ হইবে, এ বয়সেই যেরূপ মিথ্যাবাদী হইয়াছে, কালে একটা রবীন্দ্রনাথ কিংবা শরৎচন্দ্র না হইয়া যায় না।

স্বাস্থ্য-শিকার

প্রমথবাবু শীতের ভোরে কম্ফর্টর মুড়িয়া ওভারকোট চাপাইয়া প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। জনশূন্য রাজপথে লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া দ্রুত হাঁটিয়া চলিয়াছেন। ঘণ্টাখানেক রমনার কুয়াশাচ্ছন্ন প্রান্তরে পরিভ্রমণ করিয়া বাড়ী ফিরিবেন।

এই স্বাস্থ্যোন্নতিওয়ালাদের কিন্তু আমার কোনোকালেই ভালো লাগিল না। কাপাসের তপ্তসুখে থাকিতে ইহাদের যে কোন্ কুসংস্কারের ভূত ভোর না হইতে কিলাইয়া ঘরের বাহিরে আনে ভাবিয়া পাই না। স্বাস্থ্যের যে উত্তরোত্তর কোনো উন্নতি হইতেছে তাহা নয়। প্রমথবাবুর কৃশ গণ্ডদ্বয়ের কন্‌কেভিটির কিছু মাত্র হ্রাস নাই। আবার, যিনি মেদ-লাঘবের উদ্দেশ্যে কৃচ্ছ্রসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারও পরিশ্রমের উত্তাপে এক ফোঁটা মেদও গলিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। অথচ ইহাদের প্রত্যেকের ধারণা, স্বাস্থ্যের অবনতির পথটা অন্ততঃ বন্ধ রহিয়াছে। প্রাতর্ভ্রমণ ছাড়িলেন কি হুহু করিয়া গাল ভাঙিতে কিংবা গড়িতে লাগিল।

শরীর-পালন জিনিসটি অবশ্যই খারাপ নয়। এমন কি, ইস্কুলের প্রবন্ধ রচনার বাহিরেও ইহার যথেষ্ট স্থান আছে। কিন্তু স্থান থাকিলেও, আমি বলিব, কাল এবং পাত্র ভেদ

আছে। সকলের পক্ষে কিংবা সকল বয়সে শরীর গঠনের চেষ্টা সুস্থ মনের পরিচয় নয়। একটি সদ্য যুবকের পক্ষে মেদ সম্বন্ধে সতর্কতা স্বাভাবিক, কৃশতা পরিহারের চেষ্টাও সময়োচিত। ইহাদের জীবন-যাত্রা সবে সুরু হইয়াছে, দুস্তর পথ অতিক্রম করিবার প্রাক্কালে শরীরটা মজবুত করিয়া লওয়াই উচিত। তাছাড়া, ময়ূরের পেখম-বিস্তারের মতো দেহচর্য্যা তারুণ্যের স্বাভাবিক ধর্ম্ম। ইহাতে দোষের কিছু নাই। আবার, বার্দ্ধক্যের সীমায় যিনি পৌঁছিয়াছেন এবং নেহাৎ বাঁচিয়া থাকাটাই যাঁহার পেন্সন-প্রাপ্তির মূলধন, তাঁহার পক্ষেও শরীর-রক্ষার আয়োজন নিন্দার নয়। কিন্তু না-যুবক না-বৃদ্ধ বলিয়া যে-দলটি আছেন, আমার মতে, তাঁহারা এই কৃচ্ছ্র সাধনে প্রাণপাত না করিলেও পারেন। আমি প্রত্যহ ঘুম ভাঙিয়া দক্ষিণের জানালায় দাঁড়াইয়া দেখি, পাড়ার মুন্সেফবাবুটি মেদ-লাঘবের অভিপ্রায়ে হাফ্‌প্যাণ্ট পরিয়া সম্মুখের মাঠটিতে বৃত্তাকারে দৌড়াইয়া ফিরিতেছেন। দেখিয়া হাসি পায়। বর্ত্তুল হওয়াটাই যথেষ্ট হাস্যকর, বৃত্তাভ্যাস তো আরও কৌতুকের বিষয়। ওদিকে প্রায় একই সময়ে প্রমথবাবু বেড়াইয়া ফিরিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়াও হাস্য সম্বরণ করা কঠিন। মাল-কোঁচা-আঁটা ধুতির উপর ওভার-কোট চাপাইয়া অগ্র-পশ্চাৎ দ্রুত হস্ত সঞ্চালন পূর্ব্বক ভীম বেগে ডবল মার্চ্চ পদ্ধতিতে হাঁটিয়া আসিতেছেন। মুখমণ্ডলে একটি দারুণ বদ্ধপরিকর ভাব। অর্থাৎ স্বাস্থ্য কেমন করিয়া না ফিরিয়া পারে, একবার

দেখিয়া লইব, চালাকি পাইয়াছে নাকি? অথচ বৎসরের পর বৎসর এতখানি দ্রুত পশ্চাদ্ধাবন করিয়াও এ যাবৎ স্বাস্থ্যের নাগাল পাইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

আমার মতে, জীবনের উত্তর-তিরিশ পর্য্যায়ে শরীরের প্রতি ঘটা করিয়া মনোযোগ দেওয়া অস্বাভাবিক, কিঞ্চিণ্মাত্রায় অশোভনও বটে। যথাকালে যাহা হয় নাই, অথবা যে সময়ের যাহা নয়, তাহা লইয়া অকালে অতখানি উৎসাহিত না হওয়াই ভালো। তাছাড়া, শরীরের ধাত বলিয়া যে জিনিসটি আছে, তাহার বিরুদ্ধে কুস্তি করা চলে না। যাঁহার রোগার ধাত, তিনি কখনোই মোটা হইবেন না। আবার যিনি মোটা, তাঁহার অচিরে কিংবা আদৌ সূক্ষ্ম হইবার কোনো আশা-ই নাই। সুতরাং গৌরবণ-লুব্ধা কৃষ্ণাঙ্গীর ন্যায় ধুঁতুলের ছোবড়ায় বৃথা গাত্র মার্জ্জনা করিয়া লাভ নাই। এ সামান্য জ্ঞানটুকু যে ইহাদের কেন হয় না, ভাবিয়া পাই না।

কোনো বয়স্ক ব্যক্তির শরীর-চর্চ্চা দেখিলে বোধ হয়, ইনি মনের দিক হইতে এখনো বয়স্ক হন নাই। মনের কোনো অবলম্বন নাই বলিয়া দৃষ্টিটা অন্তর্মুখী না হইয়া এতটা বয়স পর্য্যন্তও প্রসাধন টেবিলের উপর নিবদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু যিনি মানসিক ভাবে সমৃদ্ধ, যিনি কোনো কিছু লইয়া তন্ময় হইয়া থাকিতে পারেন, শরীরের ওজন সম্বন্ধে তাঁহার কোনো সচেতনতা নাই। তাঁহার সমস্ত সত্তা এমনই এক বৃহত্তর পরিণতির পথে অগ্রসর হইয়া

আছে যে দেহের অস্তিত্ব সেখানে গৌণ—দুই এক পাউণ্ড হেরফের হইলেও মনোযন্ত্রের কম্পাস কাঁটা বিচলিত হইবার নয়।

সরোজিনী নাইডু দেহের ওজন লইয়া নিশ্চয়ই বিব্রত নন্। তাঁহার চটুল রহস্য, তাঁহার কবি কল্পনার লঘুপক্ষের বিদ্যুৎ গতি, অতুলনীয় ভাষার জলকল্লোল, উচ্ছ্বাসে উল্লাসে ও উদ্দীপনায় এমন একটি মহা সমারোহ সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে যে, নিতান্ত স্থূলদৃষ্টি না হইলে দেহের অস্তিত্ব সেখানে লক্ষ্য হইবার নয়। স্থূলাঙ্গী তাঁহার পরিচয় নয়। তাই দেহ সুশোভিত করিবার উদ্দেশ্যে ভোরবেলায় মাঠে মাঠে দৌড় ঝাঁপ করিবার প্রয়োজন তাহার নাই। একটু ব্যক্তিগত পর্য্যায়ে নামিয়া আসিলে এ প্রসঙ্গে আমার শিক্ষক ও সুহৃদ অমিয়বাবুর নামও উল্লেখযোগ্য। আজ প্রায় কুড়ি বৎসর যাবৎ আমি ইহার সাহচর্য্য উপভোগ করিয়া আসিতেছি। মেধা, বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যের অপূর্ব্ব সমন্বয়ে তিনি এমন একটি সুসমৃদ্ধ মনোজগতের সম্রাট যে পরিচয় মাত্র আনুগত্য স্বীকার করিতে হয়। দু দণ্ড বসিলে নানাবিধ সম্পদের অকুণ্ঠদানে মনের ভাণ্ডার ভরিয়া ওঠে। অপরে যখন তাঁহাকে দেখিয়া বলেন, "আচ্ছা, অমিয়বাবু, আপনার শরীরটি এত রোগা কেন? কিছু চিকিৎসা-পত্র করুন," তখন সহসা উপলব্ধি হয় ইনি হাড়-পাঁজরা বাহির-করা চাম্‌চিকা-সদৃশ অতি কৃশকায় একটি ব্যক্তি। অথচ আমার নিকট তাঁহার যে পরিচয়, সেখানে দেহ

সৌষ্ঠবের কোনো সম্পর্ক নাই। তাঁহার আবয়বিক দিকটা কোনো দিন নজরেই পড়ে নাই। বলা বাহুল্য, অমিয়বাবু মুগুর ভাঁজেন না, তাঁহার মধ্যে অপর এক পর্য্যায়ের এমন সুস্থ, দৃঢ় ও দুর্দ্ধর্ষ শক্তি আছে যে, বাহুবল বৃদ্ধি করিবার কথা তাঁহার কোনো দিন মনে আসে নাই।

স্বাস্থ্যকামীদের বিরুদ্ধে আমার বক্তব্য এই যে দেহের বাহিরে তাঁহাদের কাহারোই পৃথক কোনো অস্তিত্ববোধ নাই। পুষ্পহীন আগাছার পরিচর্য্যার ন্যায় ইহারা প্রত্যেকে এক-একটি মনোহীন দেহদণ্ডের ডলাই মলাই লইয়া সর্ব্বদা ব্যস্ত। শরীর-সর্ব্বস্ব মূঢ়তায় আচ্ছন্ন এই সকল কুস্তিওয়ালাগণ যখন পৃথিবীর মাঠে মাঠে বৃত্তাকারে দৌড়াইয়া ফিরিতেছেন, কিংবা নানাবিধ শীতবস্ত্রে আবৃত হইয়া বেগবান ভল্লুকের ন্যায় পর্ব্বত কন্দর অতিক্রম করিতেছেন, তখন হয়তো কোথাও কোনো অনতিকৃশ সুরকার আপন মনে বসিয়া-বসিয়া ইন্দ্রজাল রচনা করিতেছে, কোথাও হয়তো সুপ্তোত্থিত কোনো অলস কবিচিত্ত দেহখানি শয্যায় রাখিয়া আকাশে উধাও হইয়াছে, হৃতস্বাস্থ্য কোনো বিজ্ঞানী পরীক্ষাগারে ছুটিয়া গিয়া পূর্ব্বরাত্রির গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়াছে।

দেহ-নিরপেক্ষ এক একটি মানসিক স্বকীয়তা ইহাদের প্রত্যেকের প্রধান পরিচয় এবং আমি ইহাদেরই পক্ষপাতী।

আলি বাবা

সেদিন ট্রামে বসিয়া পশ্চাদ্বর্ত্তী দুই ভদ্রলোকের কথোপকথন শুনিতেছিলাম। একজন বলিতেছিলেন, চাকুরীর দরখাস্ত করিয়াই জীবনটা গেল, ভালো কিছু কোনো কালে আর জুটিল না। পঁয়তাল্লিশ টাকার উপর মাগ্‌গি ভাতা চার টাকা লইয়া যে সংখ্যাটি মাসিক আয় নির্দ্দেশ করিতেছে, তাহা উনপঞ্চাশ পবনের বিকল্পমাত্র। সঙ্গীটির অবস্থাও খুব সচ্ছল নহে। তিনি বন্ধুর উক্তি সম্পূর্ণ সমর্থন করিয়া বক্তৃতায় প্রবৃত্ত হইলেন।

এতক্ষণ শূন্য মনে বসিয়া ছিলাম। চাকুরীর দরখাস্ত সম্বন্ধে দুই বন্ধুর এই নিতান্ত অভদ্র সমালোচনা শুনিয়া মন সচল হইয়া উঠিল। মানসিক ভাবে একান্ত অসমৃদ্ধ না হইলে এমন কথা কে বলিতে পারে? চাকুরীর দরখাস্তর মতো মনের খোরাক আর কিছু আছে নাকি? ধরুন, শিলংএর এক কলেজে অধ্যাপকের পদ প্রার্থনা করিয়া আবেদন পাঠাইয়াছেন। পত্রখানি ডাক বাক্সে ফেলিয়া আসিবার সঙ্গে-সঙ্গে মন-জনপদ ঘিরিয়া পাইনবনের যে হাওয়া আন্দোলিত হইয়া উঠিল, তাহার তুলনা কোথায়? মুহূর্ত্ত মধ্যে ফুটিয়া উঠিল: ছোট্ট একখানি বাংলা, যাতায়াতের সরু আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথ, পিছনে নাতিশীর্ণ একটি নির্ঝরিনী, নিম্ন উপত্যকা হইতে উত্থিত পাইন গাছের গুটি

কয়েক মৃদুগন্ধী পত্রশীর্ষ,—সর্ব্বসমন্বয়ে কল্পনার এমন পরিপূর্ণ ভোজ আর কিসে সম্ভব? কিছুদিন কেবলই মনে হইতে থাকিবে আপনার শৈলাবাস সুরু হইয়া গিয়াছে। দিনগুলি অসম্ভব ভালো কাটিতে থাকিবে, এমন কি, মেজাজে চেরাপুঞ্জির সজলতা লাগিয়া পরিবারবর্গের প্রতি আপনার স্বভাব-সুলভ দৌরাত্ম্যটাও কমিয়া আসিবে।

লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন, চাকুরীর দরখাস্তকারীরা সাধারণতঃ প্রার্থিত চাকুরীর প্রসঙ্গে একেবারে নীরব। পাছে জানাজানি হইয়া যায়, পাছে কাহার কোন্ চক্রান্তে চাকুরীটা ফাঁসিয়া যায়, সেই ভয়ে ইহারা সর্ব্বদা সশঙ্ক, এমন কি স্বগত আলোচনা করিয়া নিজের মনকেও এসম্বন্ধে প্রশ্রয় দিতে অনিচ্ছুক। আপনি হয়তো কোনো সূত্রে গোপন খবরটি জানিতে পাইয়াছেন। দেখা হইতে জিজ্ঞাসা করিলেন, কী মশাই, আমাদের মায়া কাটিয়ে কোথায় নাকি চল্লেন? প্রশ্ন শুনিয়া অপর পক্ষ একেবারে অবাক। আকাশ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া শূন্য প্রেক্ষণে আপনার দিকে চাহিয়া রহিলেন, যেন কিছুই জানেন না। ইহাই সাধারণ রীতি।

কিন্তু অতি-সাবধানী এই ধরনটি আমার পছন্দ নয়। চাকুরী-প্রাপ্তির সম্ভাবনা লইয়া প্রগল্‌ভতা অবশ্যই বর্জ্জনীয়। কিন্তু তাই বলিয়া মনটাকে একেবারে কম্বল-চাপা দিয়া রাখাটাও কোনো কাজের কথা নয়। উহাতে ভাগ্য অগ্রসর হয় না, মনটা অনর্থক হাঁপাইয়া মরে। আপনি

হয়তো বলিবেন, কল্পনার আকাশে রঙীন ফানুস ছাড়িয়া বালকের ন্যায় করতালি সহকারে নৃত্য করিয়া লাভ কী? দুই চারদিন না-হয় পাইন বৃক্ষের শাখায়-শাখায় নৃত্য করিয়া ফিরিলেন, কিন্তু যেদিন শিলং-শৈলশিখর হইতে একেবারে ব্রাহ্মপোত্র উপত্যকায় প্রচণ্ড বেগে নিক্ষিপ্ত হইবেন, সেদিন? সেদিন? কেন, সেদিন যে কল্পনার ছায়াচিত্রে বারাণসীর গঙ্গা-স্রোত উচ্ছলিত হইয়া উঠিয়াছে! মনিকর্ণিকার জনসমারোহ এবং গোধূলিয়ার স্বর্ণ গোধূলি মনের চিত্রপটে নবতর রূপ সৃষ্টি আরম্ভ করিয়াছে, কারণ হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকারী অধ্যাপকের পদ প্রার্থনা করিয়া ইতিপূর্ব্বেই পত্র প্রেরণ করা হইয়া গিয়াছে!

আমি ভাবিয়া পাই না, কল্পনার যে আনন্দ, তাহাকে অবাস্তব আখ্যা দিয়া তুচ্ছ করিবার হেতু কী? আনন্দ জিনিসটি তো আসলে মনের? পঞ্চেন্দ্রিয় উত্তীর্ণ হইয়া প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা যখন মানসিক অনুভূতিতে রূপান্তরিত হয়, তখনই উহা আনন্দ। পঞ্চ ইন্দ্রিয় যেন পাঁচটি ভৃত্য। তাহারা নানাবিধ ভোজ্য বহিয়া আনিয়া সম্মুখে রাখে, বসিয়া বসিয়া উপভোগ করে মন। সেই যে বিদায় লইবার সময় ছেলেটি বলিয়াছিল, 'কাল যাচ্ছি, তোমার কী মত?' আর মেয়েটি অপরূপ ভঙ্গী হানিয়া বলিয়াছিল, 'আহা, আমার কথায় কত না এসে যায়', বিদায়ের সেই মুহূর্ত্তে ইহার কতখানি উপভোগে আসিয়াছিল, বলুন তো? তারপর কতদিন কত মন্থর দুপ্রহরের অলস অবসরক্ষণে, কত বাসন্তী পূর্ণিমার

বিনিদ্র প্রহরে প্রহরে ছবিখানি কল্পনায় ভাসিয়া উঠিয়াছে, আর প্রেমিক মন আনন্দে বিভোর হইয়াছে। আপনি হয়তো বলিলেন, এ আনন্দটি তো নিছক কল্পনাপ্রসূত নয়, ইহার পিছনে একটি নির্জ্জলা সত্য ঘটনা রহিয়াছে যে। সেই কথাতেই আসিতেছিলাম। অনুভূতি আরো খানিকটা সূক্ষ্ম হইলে মনের আনন্দ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতারও অপেক্ষা রাখে না। তখন ইতিহাস রোমন্থন না করিয়াও মন রসভুঞ্জনে সমর্থ হয়, এবং আমার মতে ভোগের উহাই রাজকীয় পদ্ধতি।

রাজকীয় পদ্ধতিটির বিশেষত্ব এই যে রন্ধন গৃহের ঝামেলা পোহাইয়া পাক প্রস্তুত করিবার প্রয়োজন ইহাতে নাই। ছাই ফেলিয়া, চূলা ধরাইয়া, চোখ ধাঁধাইয়া ঘটনার কড়া-পাকে আনন্দ নাড়ু তৈরী করিবার দুর্ভোগ রাজাকে পোষায় না। মেজাজ মর্জ্জি হইল তো মুহূর্ত্তের ইঙ্গিতে কল্পনার ছায়াপট ঝিল্‌মিল্ করিয়া উঠিল, সঙ্গে-সঙ্গে মধু মোম ও শিলাজতুর সন্ধানে হাজার মনোমক্ষিকার রামধনু-পাখা আকাশ-গঙ্গার স্বর্ণরেখা ধরিয়া উধাও হইয়া গেল। বস্তুতঃ মনের দিক হইতে মানুষের রাজা কবি এবং কবি-চিত্ত অনন্যপুষ্ট ও স্বয়ম্প্রতিষ্ঠ। ঐতিহাসিক কলম উঁচাইয়া বসিয়া আছে, রাম-রাবণের যুদ্ধটা কবে শেষ হইবে। বাল্মিকী-প্রতিভা রাম না জন্মিতে রামায়ণ-কাব্য কল্পনায় প্রবৃত্ত হইয়াছে।

যাহারা মনোমুদ্রার সিকি দোয়ানি লইয়া অতি সাবধানে গুনিয়া গাঁথিয়া জীবন রহস্যের বিকি-কিনিতে প্রবৃত্ত হয়,

তাহারা এই কল্পনার রাজভোগ হইতে নিতান্তই বঞ্চিত। তাহারা দিনের পর দিন শ্যামবাজারের ট্রামে বসিয়া মাগ্‌গি ভাতার হিসাব কষিতেছে, বিশ্ব রহস্যের বিপুল ভাণ্ডারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া চিচিং ফাঁক ভুলিয়া গিয়া আলু বেগুনের নাম ধরিয়া হাঁক ছাড়িতেছে। তাহারা দরখাস্ত পাঠাইয়া দিয়া বাহিরে অপেক্ষা করিয়া আছে, দরজা কখন ফাঁক হইবে।

কিন্তু যাহারা কল্পনার রাজা, তাহাদের দরখাস্ত পেশ হইবামাত্র ডাক পড়ে। ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিয়া বাড়ীতে ফিরিয়া আসিলে গৃহিণী আর হাঁটিয়া জল আনিতে যাইতে রাজি ন'ন। গো-শকটের বন্দোবস্ত হইতে থাকে।

নামনীতি

স্বনামধন্য হওয়া সকলের ভাগ্য নয়। কিন্তু নামের স্বকীয়তা সকলেই আশা করেন। ধরুন, আপনার নাম অমলেন্দু দাশগুপ্ত। এ নামে বাংলা দেশের একাধিক ব্যক্তির পরিচয়। কিন্তু তাই বলিয়া অন্য এক অমলেন্দু দাশগুপ্ত আপনার ঘাড়ে চাপিবে, ইহা আপনাব অবশ্যই পছন্দ নয়। আপনার নিজের মহিমায় স্বনামীয় অপর ব্যক্তির খ্যাতি যেমন অবাঞ্ছনীয়, অপর কোনো স্বনামীর কীর্ত্তির সঙ্গে নিজের সংশ্লিষ্ট হইয়া পড়া-ও আবার তেমনি বিরক্তিকর। নিন্দা তো নয়ই, অপরের খ্যাতিটাও নামের বিভ্রাটে নিজের ঘরে আসিলে অস্বস্তি বোধ হয়। আমি যা, আমি তা-ই, এবং আমি তাহাতেই সন্তুষ্ট—সকলেরই এই কথা।

আমার দুর্ভাগ্য, আমার নামটি বহু লোকের পছন্দ। কেবল প্রথম নামটি নয়, একেবারে সর্ব্বনাম। এই সর্ব্বনামে অপরের বিশেষণ আমার পক্ষে বড় বিপত্তির কারণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিধাতার পরিহাস, আমার স্বনামী সম্প্রদায়ের অনেকেই কৃতী পুরুষ, তাঁহাদের তুলনায় আমি অতি নগণ্য। ইহাদের একজনের কথা বিশেষ করিয়া বলিতে হয়। তিনি আমার সমধর্ম্মী অর্থাৎ সমজীবী। কেবল

তাহাই নয়, আমাদের উভয়ের ছাত্রকালীন অধ্যয়ন একই বিশ্ববিদ্যালয়ে, আমাদের অধ্যাপনাও একই শাস্ত্রে। কিন্তু তিনি ডাক্তার, আমি কম্পাউণ্ডর; তিনি বিশেষজ্ঞ, আমার জ্ঞানে বৈশিষ্ট্যের অভাব। এই কিঞ্চিৎ সম ও কিঞ্চিৎ বিষমের ফল আমার দিক হইতে বড় বিষময় হইয়া উঠিয়াছে। অনেকেই আমাকে সেই ডাক্তার বলিয়া ভুল করেন, তাঁহাব জ্ঞানগর্ভ পুস্তকের জন্য আমাকে প্রশংসা করেন, তাঁহার পাণ্ডিত্যের গভীরতায় আমাকে খাতির দেখান। এ অবস্থায় পড়িয়া আমাকে তৎক্ষণাৎ স্বরূপ প্রকাশ করিতে হয়। সঙ্গে-সঙ্গে অপর পক্ষের কথা কমিয়া আসিতে থাকে, সসম্ভ্রম দৃষ্টি সহসা স্তিমিত হইয়া যায়। কী ফ্যাসাদ বুঝিতেই পারেন। ব্যাপারটি ইদানীং এত ঘোরতর হইয়া পড়িয়াছে যে, কোনো বিদ্বান সমাজে প্রবেশ করিতেই আমার ভয় হয়। সেখানে আমার কণ্ঠে কেকাধ্বনি উচ্চারিত না হইলেও—অর্থাৎ কার্য্যের সঙ্গে কোনোরূপ কলাপের প্রতারণা না থাকা সত্ত্বেও—আমার বায়স-রূপ লোকের চোখে মালুম হয় না। বেগতিকে পড়িয়া আমাকেই ময়ুরপুচ্ছ খসাইয়া দেখাইতে হয়। ন্যাড়া ল্যাজটিতে অযোগ্যতা বাহির হইয়া পড়ে, মনে হয় যেন চুরি করিতে গিয়া সকলের সামনে ধরা পড়িয়া গেলাম।

অথচ এই দু'একটি মহাপণ্ডিত যদি দয়া করিয়া আমার নামটির পরিবর্ত্তে অন্য কোনো নাম পরিগ্রহ করিতেন, তাহা হইলে আর এ বিপত্তি ঘটিত না। তাঁহারা ক্ষণজন্মা,

তাঁহারা ধূমকেতু, তাঁহাদের খ্যাতির পুচ্ছ অগ্নিময়। আমার মতো পুচ্ছহীনের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া আমার নামটি কাড়িয়া নেওয়া তাঁহদের উচিত হয় নাই। তাঁহাদের এই অবিবেচনার ফলে আমার এমন একটি নাম-গোত্রহীন অবস্থা হইয়াছে যে, সমাজ বিশেষে আমার অস্তিত্বের কোনো স্বীকৃতি নাই, সেখানে আমি ভূতের মতো ঘুরিয়া বেড়াই। বন্ধুরা বলেন, ডাক্তারিটা পাশ করিয়া নিলেই তো পারিতে, ল্যাঠা চুকিয়া যাইত। কিন্তু তা তো নয়। তাহা হইলে যে বিপত্তি আবার অন্যভাবে ঘনীভূত হইয়া উঠিত। তখন আকারে প্রকারে রামু ও শ্যামুতে কিছুই প্রভেদ থাকিত না, যমজ ভাই ছ'টিকে লইয়া লোকে আরেক ফ্যাসাদে পড়িয়া যাইত। বরং যমজের একটি যখন চোখে-মুখে ডিগ্রি আটিয়াছেন, অন্যটি বুদ্ধি করিয়া ভেদ-বোধ উৎপাদন প্রয়াসে তাহা করে নাই। তাহার সে সুবুদ্ধির প্রশংসা নাই। পুরস্কারে লাঞ্ছনা বরাদ্দ হইয়াছে।

আমার নামটি অবশ্য আমি নিজে রাখি নাই। ওটা পৈতৃক। নামকরণের সময় আমার পরামর্শ লওয়া হইলে বলিতাম, এমন নাম রাখা হোক যাহা কল্পনায় আনা অন্যের বাপের সাধ্য নয়। সাধ্য হইলেও রাখিবার মতো নয়। যাঁহার নাম বিরিঞ্চিবাঞ্ছা অথবা ত্রিষ্টুপ মুখোপাধ্যায়, তিনি কী সুখেই না আছেন। তাঁহার নাম কাড়িবে এমন শক্তি-মান কে আছে? তিনি যতদিন বাঁচিয়া থাকিতে চান, অদ্বিতীয় হইয়া বাঁচিয়া থাকিবেন। একদা ভাবিতাম, এই

বিজাতীয় নামধারীদের কী বিপত্তি। বিরিঞ্চি বাঞ্ছা বাবুকে নাম জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর শুনিয়া তুমুল হাসাহাসি পড়িয়া যায়। নামটা তাঁহার গলগ্রহ, পৈতৃক দেনাও বোধ করি অতটা বিড়ম্বনা নয়। কিন্তু ইদানীং এ ধরণের নামকে অতখানি পরিহসনীয় বলিয়া মনে হয় না। বরং মনে হয়, নাম রাখিতে হইলে নামের স্বকীয়তাবিধান একটি আবশ্যিক নীতি। যে নাম বহু-বাঞ্ছিত, তাহাতে ব্যক্তির নির্দ্দেশ হয় না।

এই নামনীতি উপলব্ধি করিয়া অধুনা আরেকটি পরিহাস হইতে বিরত হইয়াছি। আপনারা সকলেই জানেন, কোনো তরুণ দম্পতির প্রথম সন্তান লাভ হইলে নামকরণের ব্যাপার লইয়া তাঁহারা একটি ঘোরতর সমারোহ সৃষ্টি করেন। কী নাম রাখা যাইতে পারে? আপনার পিসতুতো ভগ্নী চিঠি লিখিলেন : তুমি তো ভাই সাহিত্যিক, বাবলুর একটি ভাল নাম রাখিয়া দাও না। ডাক-নাম হিসাবে 'বাবলু'টা একালে বড় ফ্যাশানদুরস্ত অভিজ্ঞান। ইহার জন্য আপনার সহযোগ আবশ্যক নয়। উহা বাবলু-সম্প্রদায়ের উদ্ভব না হইতেই স্থির হইয়া আছে। কিন্তু ভালো নাম? এই সামান্য সমস্যায় তরুণ দম্পতির অসামান্য দুশ্চিন্তা দেখিয়া পূর্ব্বে বড় কৌতুক অনুভব করিতাম, কিছুটা বিরক্তি বোধও হইত। ভাবিতাম কী এমন অরূপ রতন লাভ করিয়াছো, যে জন্য এই তাণ্ডব? যেমন তেমন একটা কিছু রাখিয়া দিলেই তো হয়।

কিন্তু ইদানীং আর সে রকম মনে হয় না। এখন বুঝিতে পারিয়াছি, নাম রাখা বড় কঠিন কাজ। এ কাজ যেমন তেমন করিয়া সারিলে চলে না। আপনার পিসতুতো ভগ্নীর অবশ্য ঠিক এ ধরণেব বোধ নাই। তাঁহার ইচ্ছা একটি ভালো নাম, যে-ইচ্ছার তাড়নায় একাধিক তরুণী শান্তিনিকেতনে গিয়া অশান্তি সৃষ্টি করিয়াছেন। যাঁহার অতখানি সাধ্য নাই, তিনি অগত্যা সাহিত্যিক ভ্রাতাদের শরণাপন্ন হ'ন, এবং একটি 'সুন্দব' নাম প্রার্থনা করেন। সুন্দরের সংজ্ঞা দেওয়া মুস্কিল। তবে, হালের চলন দেখিয়া মনে হয়, পার্থপ্রতিম সুন্দব নাম, পার্থসারথি-ও সুন্দর, তীর্থঙ্কর, দীপঙ্কর, অভিনন্দা, অলকনন্দা ইত্যাদিও সুন্দরের অন্তর্গত। কিন্তু সুন্দর নাম রাখা বিপজ্জনক। আপনার মেয়েটির নাম অভিনন্দা শুনিয়া আমিও আমার ভাগিনেয়ার নাম অভিনন্দা রাখিব। আপনার নামরুচির বাহাদুরিটা সকলে লুটিয়া খাইবে। অতঃপর যাবতীয় কন্যাসম্প্রদায় ওই একই নামে অভিহিত হইলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অবসান ঘটিয়া নামনীতির বিপর্য্যয় উপস্থিত হইবে।

নাম রাখিতে হইলে তাই দুইটি জিনিস বর্জ্জনীয়,—সুন্দর ও সাধারণ। সুন্দর নাম সকলে কাড়িবে, আর সাধারণ নাম সকলেরই মনে আসিবে। সুতরাং এ দু'য়ের কোনটিতেই ব্যক্তির বিশিষ্ট চিহ্ন লাভ হইবে না। এজন্য নামের সন্ধানে—একরকম বাধ্য হইয়াই—'অসাধারণ' স্তরে নামিয়া আসিতে হয়। যদি আপনার ছেলেটির নাম এই অসাধারণ

পর্য্যায়ের হয়, তাহা হইলে এক নামের জোরেই তাহার ভবিষ্যতের বহু দুর্ভোগ বাঁচিয়া গেল। কেবল কি তাহারই বাঁচিল? আপনারও কম বাঁচিল না। যদি ছেলেটি শৈশবে কুম্ভমেলার ভিড়ে হারাইয়া যায়, কিংবা যৌবনে বাড়ী হইতে নিরুদ্দেশ হয়, তবে আর বিজ্ঞাপনে বলিতে হয় না যে, পিতার নাম মাধবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, দেশ পাবনা জেলা, এবং বাঁ কাঁধের উপর একটি কাটা দাগ আছে। নামটি বিজ্ঞাপিত হইলেই যথেষ্ট। এমন কি, একথাও বলা যায় যে এমন ছেলের হারাইয়া যাওয়াই মুস্কিল, অজ্ঞাতবাসও অসম্ভব। নাম যত সার্থক হইবে, নিরুদ্দেশ হওয়া তত কঠিন হইবে। কারণ, মঞ্জুলিকা-সম্প্রদায়কে লইয়া ফরাক্কাবাদে পলায়ন করিলেও পুলিন-সম্প্রদায়কে সেখানে গিয়া চাকরি করিতে হইবে। পুলিন-সম্প্রদায় অবশ্যই গ্রাজুয়েট। ডিগ্রির সত্যতার জন্য আবেদনপত্রে আসল নামটি না জানাইয়া উপায় নাই। আর নামটি জানাইলেই অজ্ঞাতবাস খতম।

বোধ হয় রবীন্দ্রনাথও একথাটি জানিতেন। তাই পুলিন চট্টোপাধ্যায়কে নামে অসাধারণ করিতে তিনি রাজী হ'ন নাই।

রেকুইজিশন

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের জরুরী আদেশ আসিয়াছে, আগামী পাঁচ দিবসের মধ্যে মিলিটারির জন্য বাড়ী খালি করিয়া দিতে হইবে। মাসাবধি এই ভয়টাই করিয়া আসিতেছিলাম। কায়রো এবং তিহারান কন্‌ফারেন্সের পর হইতে ভয়টা আরো ঘনাইয়া আসিতেছিল। আজ দেখিতেছি, সত্য-সত্যই পালে বাঘ পড়িল। অথবা সিংহই পড়িল, কারণ, ব্রিটিশ-সিংহকে ব্যাঘ্রচর্ম্মে আবৃত করিয়া লাভ নাই। উহাদের 'পশুরাজ' নাম হরণ করে কাহার সাধ্য ?

কথাটা গৃহিণীকে জানাইবার অভিপ্রায়ে রন্ধনশালার দ্বারপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন স্কুল-কলেজের বেলা হইয়া গিয়াছে, তিনি অতিশয় কর্ম্মব্যস্ত, মরিবার ফুরসৎ নাই। মেজাজ চড়িয়া থাকিবারই কথা, তদুপরি কাষ্ঠের ইন্ধন। পারিপার্শ্বিক সর্ব্বপ্রকারেই ধূমায়িত। যুদ্ধের বাজারে কয়লা দুষ্প্রাপ্য এবং মহার্ঘ হওয়াতে ইদানীং অনেক গৃহস্বামীকেই নবকুমারের মত কাষ্ঠাহরণে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে। কয়লা এবং হীরকের মৌলিক সাদৃশ্যটা এতদিনে মালুম হইতেছে—এই মর্ম্মে একটা রসিকতা করিতে গিয়া কিছুদিন পূর্ব্বে গৃহিণীর নিকট লাঞ্ছিত হইয়াছিলাম। রান্নাঘরের অবস্থা দেখিয়া ঐন্ধনিক আলোচনাটার পুনরাবৃত্তি

হইবার আশঙ্কায় শঙ্কিত হইয়া উঠিলাম। কিন্তু পশ্চাদ্‌পদ হইয়াই বা লাভ কি? ইহা হইতেও যে ঘোরতর বিপদ সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে, এবং এবারে আমাকেও যে নাকের জলে চোখের জলে একাকার হইতে হইবে, সে কথাটা গোচর করিলে হয়তো বা তাঁহার আনন্দই হইবে—ভাবিয়া সাহস সঞ্চয় করিতে লাগিলাম।

শেষকালে বার কয়েক ঢোক গিলিয়া কথাটা বলিয়াই ফেলিলাম। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, গৃহিণীর ভাবগতিকের বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম ঘটিল না। রন্ধনের প্রতি মনোযোগ আরো এক পর্দ্দা চড়াইয়া কেবলমাত্র বলিলেন, আজ কলেজ ক'টায়? বুঝিলাম, বিবাহের সময় অন্নবস্ত্রসংস্থানাদি সম্বন্ধে সংস্কৃত ভাষায় যে প্রতিশ্রুতিটা দিয়াছিলাম, তাহাই স্মরণ করিয়া তিনি সংসারের কোনো কোনো বিষয়ে পরম নিশ্চিন্ত হইয়া আছেন, এবং বর্ত্তমান আলোচনায় যোগদান করিবার কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই।

বলিলাম, কলেজ বারোটায়। তৎপর তাঁহার রন্ধন-তৎপরতা এতখানি বাড়িয়া গেল যে, নির্ব্বোধের মতন কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে অপসৃত হওয়া ছাড়া উপায় রহিল না।

ফিরিয়া আসিয়া বহির্ব্বাটিতে আরাম-কেদারায় উপবেশন-পূর্ব্বক সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করিলাম। তাম্রকূট কূট-সমস্যার অব্যর্থ মহৌষধ। ছাত্রজীবনে যাঁহারা এম. এ. কিংবা প্রেমে পড়িয়াছেন, তাঁহারাই জানেন, বিনিদ্র রজনী

জাগিয়া পাঠচর্চ্চা কিংবা কবিতাচর্চ্চার পক্ষে ইহা কত বড় সহায়। ঘন ঘন সিগারেটে টান দিতে লাগিলাম। কিন্তু কোনো ফলোদয় ঘটিল না। ক্ষণপরে বিরক্ত হইয়া উঠিয়া পড়িলাম, এবং স্নানাহার সারিয়া কলেজে চলিয়া গেলাম। মাথায় এত বড় একখানি গন্ধমাদন পর্ব্বত লইয়া কেহ কোনোদিন অধ্যাপনা করিতে যায় নাই। মেজাজটা খিঁচড়াইয়া গিয়াছিল। ফলে, ক্লাসে একটি ছাত্রকে তিন দিনের হাজিরা কাটিয়া অনর্থক বাহির করিয়া দিলাম। টিউটোরিয়াল ক্লাসে একটি ছাত্রীকে 'সি-মাইনাস্' দেওয়াতে সে ভ্যাঁ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

পরদিন সৌভাগ্যক্রমে রবিবার। চা পান করিয়া ছাতিটি মাথায় দিয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। যেমন করিয়া হোক, একটি বাসস্থান খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে। নয় তো কি স্ত্রীপুত্রের হাত ধরিয়া পথে বসিব? পূর্ব্বদিন কলেজের এক সহানুভূতিসম্পন্ন সহকর্ম্মীর নিকট শুনিয়াছিলাম, ওয়ারী অঞ্চলে নাকি একখানি বাড়ী খালি আছে। সুতরাং তদুদ্দেশ্যেই যাত্রা করা গেল। পথে প্রাণকৃষ্ণবাবুর সহিত দেখা। চিত্রিত চটের থলে হাতে শশব্যস্তে বাজারে চলিয়াছেন। উহার বাড়ীর উপর নিশ্চয়ই নোটিশ পড়ে নাই। নচেৎ রবিবারের সকালটা এই ভাবে মাটি করিতেন না। আমার সহিত চোখোচোখি হইতেই হাঁকিলেন, আরে, সোমনাথবাবু যে, এত সকালে ইদিকে কোথায়? মনে-মনে বলিলাম, চুলায়। মুখে বলিলাম, বাড়ীতে মশাই ম্যাজিস্ট্রেট

সাহেবের নোটিশ পড়েছে। পয়লা তারিখ বাড়ী ছাড়তে হবে। অথচ, যাই কোথা, বলুন? আপনাদের ওদিকে বাড়ীটাড়ী খালি আছে?

প্রশ্নের উত্তর এড়াইয়া, মুখমণ্ডলে দারুণ অসন্তোষের অভিব্যক্তি ফলাইয়া প্রাণকৃষ্ণবাবু বলিলেন, হুঁঃ, যুদ্ধ করবি ব্যাটারা, কর্। তা না, ভালো বাড়ী চাই, ভালো দানাপানি চাই, হ্যানো চাই, ত্যানো চাই। নাঃ, দেশটার আর কিছু রাখলে না।—বলিয়াই ঝাঁকা-মাথায় ধাবমান এক মৎস্যজীবীর উদ্দেশ্যে অন্তর্হিত হইলেন।

অগ্রসর হইয়া চলিলাম। সম্মুখেই ওয়ারী। বাঞ্ছিত পল্লীতে ঢুকিয়া এ-বাড়ী ও-বাড়ী দেখিতে দেখিতে পথ অতিক্রম করিতে লাগিলাম। পূর্ব্বদিন এত অপ্রকৃতিস্থ ছিলাম যে, খালি বাড়ীটার ঠিকানাটা পর্য্যন্ত চাহিয়া লইতে মনে ছিল না। একটা To Let কোথাও চোখে পড়িয়া যাইবে, এই আশায় হাঁটিয়া চলিলাম। To Let-টা ইতিমধ্যে Too Late-এ পরিণত না হইয়া থাকিলে বাঁচি। যে রেকুইজিশনের হিড়িক পড়িয়াছে! এতদিন তো নেকড়ে বাঘটাকে তাড়াইয়া দিন কাটিয়াছে। চাউলের যদি বা একটু সুরাহা হইয়াছে, এখন আবার জানালা-কপাট লইয়া টানাটানি। প্রাণকৃষ্ণবাবু ঠিকই বলিয়াছেন। তোরা কি ঘরে বসিয়া যুদ্ধ করবি? গোটা আরাকানটাই তো পড়িয়া রহিয়াছে। সেখানে গিয়া তাঁবু ফেলিলে তোদের বাইবেল অশুদ্ধ হইয়া যাইবে নাকি? কই, রামায়ণ-

মহাভারতে তো বাড়ী রেকুইজিশনের কোনো সংবাদ পাই না, অথচ রাম-রাবণের যুদ্ধটা কি আজিকার এই কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড হইতে কিছু কম হইয়াছিল, না, কুরুক্ষেত্রেই নরহত্যা কম হইয়াছিল ?

বিপরীত দিক হইতে দুইটি ভদ্রলোক আসিতেছিলেন। বেশভূষার বেসরকারী ভাব দেখিয়া বুঝিলাম, তাঁহারা উভয়েই এই অঞ্চলবাসী। শীতের সকালে প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন। মুখোমুখি হইতে একজন অযাচিতভাবে কাছে আসিয়া সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মশাই যেন কি খুঁজে বেড়াচ্ছেন ?

গোড়াতেই এতখানি সহানুভূতি আশা করি নাই। লক্ষণ শুভ এবং ভাগ্য প্রসন্ন বলিয়া মনে হইল। উৎসাহিত হইয়া নিতান্ত আপনজনের মতো আবদারের সুরে নিবেদন করিলাম, একটি ভাল বাসা খুঁজছি।

ভালবাসা খুঁজছেন ?—ভদ্রলোক যেন তিরস্কার করিয়া উঠিলেন।

অপ্রত্যাশিত ব্যঙ্গটা সহসা ঠাহর করিতে না পারিয়া আঁতকাইয়া উঠিলাম। তাই তো, কী সর্ব্বনাশ! আমার কি মতিভ্রম হইয়াছে ? আজ বাদে কাল রিটায়ার করিব, এই বয়সে একটি ভদ্রপল্লীর মধ্যখানে রাজপথে দাঁড়াইয়া ভালবাসা খুঁজিয়া ফিরিতেছি! গৃহিণী জানিতে পারিলে কি আর রক্ষা আছে ?

থতমত খাইয়া বলিলাম, আজ্ঞে, সে ভালবাসা নয়।

একখানি ভাল রকমের বাসা, মানে, বাড়ী—To let আর কি!

ইতিমধ্যে একটি ছোটখাটো ভিড় জমিয়া উঠিতেছিল। কষ্টেসৃষ্টে প্রাণ বাঁচাইয়া ছিটকাইয়া পড়িলাম এবং একটু দ্রুত পদক্ষেপণপূর্ব্বক অগ্রসর হইয়া গেলাম। এমন বদ রসিকতা জীবনে শুনি নাই। শীতের সকালে ঘামিয়া উঠিতে লাগিলাম। সর্ব্বনাশা শব্দ দুইটির মধ্যে উপযুক্ত 'সম' ফেলিতে না পারিয়া কি কেলেঙ্কারিটাই না বাধাইয়া তুলিয়াছিলাম! জীবন-সঙ্গীত বিলকুল বেসুরা হইয়া উঠিয়াছিল আর কি! অথচ আমারই নাম আবার সোমনাথ।

কিন্তু বাড়ী কোথায়? নিরালম্ব-বায়ুভূতের কোথায় সেই আশ্রয়? ভবতোষবাবুও রসিকতা করেন নাই তো? ধূ ধূ মনে পড়িল, বাড়ীটি একটি দ্বিতল অট্টালিকার নিম্নাংশ। গৃহস্বামী স্বয়ং উপরে অধিষ্ঠিত। তাঁহাকে শিরোধার্য্য করিয়া জীবনযাপন করিতে হইবে। করিতে হইবে বই কি! ভাড়াটিয়ারা চালাকি পাইয়াছে নাকি? দিব্য আরামে অন্যের গৃহে হাত-পা ছড়াইয়া বসিবেন, আর উপরওয়ালা গৃহস্বামীকে পরোয়া করিতেই যত আপত্তি! ফেলিলই বা উহারা উপর হইতে যত জঞ্জাল, বাজাইলই বা অষ্টপ্রহর রেডিয়ো, তাহাতে হইয়াছে কি? এত শৌখিন হইলে নিজে একখানি গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া থাক না রে বাপু। থাকবি অন্যের আশ্রয়ে, আর উপরওয়ালার পুত্রকন্যা-বাহিনীর একটু দাপাদাপিতেই অস্থির? জীবনে বাঁচিতে হইলে—

সহসা চিন্তাস্রোতে বাধা পড়িল। দেখিলাম, এক বাড়ীর প্রাচীরের উপর বিলম্বিত হইয়া,—না, কোনো 'টু লেট' নোটিশ নয়,—একখানি দীর্ঘ রোমশ লাঙ্গুল। তাহারই এক প্রান্তে সংযুক্ত হইয়া উপবিষ্ট এক লোহিতনিতম্ব বানর-পুঙ্গব। পূর্ব্ব হইতে জানা ছিল, একটি বানরসম্প্রদায় এই অঞ্চলের বনিয়াদী বাসিন্দা। শহরের উত্তর সীমান্তে আমাদের পাড়ায় পবনের অবারিত দাক্ষিণ্য সর্ব্বজনবিদিত। গ্রীষ্মকালে হুহু বাতাসে একটি সিগারেট ধরাইতে আধখানি দেশলাই-বাক্স খতম। এ অঞ্চলে পবনদেব আনুকূল্য করিয়াছেন অন্য প্রকারে। তাঁহার বংশধরগণ পিতৃপুরুষের নাম-মাহাত্ম্য ঘোষণা করিয়া বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে লম্ফঝম্প করিয়া বেড়াইতেছে।

বানরপুঙ্গব বোধ করি আমার অনধিকার-প্রবেশে রুষ্ট হইয়া থাকিবে। দেখিলাম, রোষকষায়িত নেত্রে অত্যন্ত তীব্র এবং সন্দিগ্ধ ভাবে আমাকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে বদন বিস্ফারিত করিল। আরে, কামড়াইবে নাকি? একটু যে ভড়কাইয়া না গেলাম, তাহা নয়। কিন্তু বাড়ীর উপর যাহার নোটিশ পড়িয়াছে, তাহার ভয় করিলে চলিবে কেন? ছাতিটা আড়াল করিয়া ডানহাতি রাস্তায় মোড় ফিরিয়া বিপদ কাটাইয়া উঠিলাম। ভাবিলাম, একবার এ পাড়ায় আসিয়া যাই, তাহার পর উহার এবং উহার যাবতীয় গোষ্ঠীর বাঁদরামি দেখিয়া লইব। রামরাজ্য আর আছে নাকি যে, উহাদের এই উৎপাত সহ্য করিতে হইবে?

এখন রীতিমত ব্রিটিশ শ্যামরাজ্যের যুগ। এ যুগের রাধার দল অশোক-কাননে অঙ্গুরী-অভিজ্ঞানে অশ্রু বিসর্জ্জন করে না। সুতরাং লঙ্কাকাণ্ড বাধাইবারও প্রয়োজন নাই, বানরকুলের তাঁবেদারিরও দরকার নাই। উহাদের যদি নির্ব্বংশ না করিতে পারি, তাহা হইলে নিজের নামই হনুমান রাখিয়া দিব।

ইতিমধ্যে বেলা বাড়িয়া উঠিয়াছে। প্রত্যুষের শীতবস্ত্র ক্রমে অসহ্য লাগিতেছে। অথচ এ যাবৎ বাড়ীর সন্ধানটি নাই। নাঃ, পাড়ার লোকের সাহায্য না লইয়া আর চলিল না। এইটাই এড়াইতে চাহিয়াছিলাম। জানাজানি হইয়া গেলে কি আর রক্ষা আছে? কত লোকের মাথায় কত দুষ্ট ফন্দি, হাতছাড়া হইয়া যাইতে কতক্ষণ? ইদানীং গৃহ-সন্ধান যেন জামাতা-সন্ধান অপেক্ষাও গোপনীয় বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

ভাগ্যক্রমে আর একটু অগ্রসর হইতেই বাড়ীর হদিশ যেন পাওয়া গেল। ওই যে বাঁ দিকে ইলেক্‌ট্রিক থামের নিকট বাড়ীটা? একটি নোটিশ ঝুলিতেছে না? আর দোতলা বলিয়াই তো মনে হইতেছে। ছুটিলাম। প্রাণ-পণে ছুটিলাম। উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলাম। কে জানে, কোন্ দিক হইতে অপর কোন্ হতভাগ্য গৃহহারা আসিয়া জুটিবে? এই প্রতিযোগিতার যুগে কী না সম্ভব? হাঁপাইতে হাঁপাইতে বাড়ীটির সম্মুখে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলাম। অনুমান সত্য। দ্বিতল অট্টালিকাটির নিম্নভাগ জনপ্রাণী-

শূন্য। দেয়ালে বিজ্ঞাপন ঝুলিতেছে—বাড়ী ভাড়া দেওয়া যাইবে, উপরে অনুসন্ধান করুণ। ক্রিয়াপদের বানান ভুলটা কাজে লাগিল। তৎক্ষণাৎ করুণ নেত্রে উর্দ্ধে দৃষ্টি উৎক্ষিপ্ত করিলাম। দেখিলাম, রেলিঙে সারি সারি লেপ তোষক ইত্যাদি ঝুলিতেছে। উপরে তাহা হইলে জন-মানবের বসতি আছে। ভবতোষবাবু ধন্য। তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতায় দুই চোখ ছাপাইয়া জল আসিল।

ঔদরিক যেমন আহারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে সম্মুখের বিবিধ খাদ্যসামগ্রীগুলিকে লোলুপ দৃষ্টিতে একবার নিরীক্ষণ করিয়া লয়, আমিও সেইরূপ বাড়ীটির নিম্নাংশের প্রতি লুব্ধনেত্রে চাহিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম। মন্দ হইবে না। অনুমানে মনে হইল, তিনখানি ঘর। আমার পক্ষে উহাই যথেষ্ট, আমার তো আর হাজার টাকা মাহিনা নয়। একখানি শোবার ঘর হইবে, আর একখানিতে ছেলেরা পড়াশুনা করিবে, তৃতীয়টি হাতের পাঁচ স্বরূপ অতিথি-অভ্যাগত পাঁচজনের বসিবার ঘর হইবে। দিব্যচক্ষে দেখিতে লাগিলাম, নূতন গৃহে আসিয়া গৃহিণী ঘর-দুয়ার গুছাইতে ব্যস্ত, ছেলেরা কে কোন্ জানালার ধারে পড়ার টেবিল পাতিবে, তাহা লইয়া হৈচৈ বাধাইয়াছে, আমি ধূম্রজালে আবৃত হইয়া বারাণ্ডায় একটি প্যাকিং বক্সের উপর উপবেশনপূর্ব্বক বিশ্রাম করিতেছি। আসন্ন সুখ-সংসারের কল্পনা করিয়া পুলকিত হইয়া উঠিলাম।

এখন একবার গৃহস্বামীর সন্ধান লওয়া যাক। রাস্তায় নামিয়া আসিয়া হাঁকিলাম, বাড়ীতে কে আছেন?

এইরূপ দুই-তিন বার। ভাড়া বেশি চাহিবে না তো? তা চাহিলই বা? বাড়ীওয়ালারা বড়লোকের জাত। উহাদের সহিত বনিবনাও করিয়া থাকাই ভালো। কত আর চাহিবে? বড় জোড় চল্লিশ? পঞ্চাশই না হয় ধরিলাম। ইহার বেশি কিছুতেই হইতে পারে না। প্রকোষ্ঠগুলি খুব একটা কিছু বড় হইবে না। গৃহিণীর নূতন পরিচ্ছদের আলমারিটা দরজা দিয়া আবার ঢুকিলে হয়! জখম হইলে আর রক্ষা নাই। সংসারে ওই এক নূতন ফ্যাসাদ আসিয়া জুটিয়াছে। রাত্রিদিন উহার উপর ঝাড়পোঁছ চলিতেছেই।

কে?

উপরওয়ালার হাঁক শুনিয়া পুনরায় উর্দ্ধদৃষ্টি হইতেই চক্ষু চড়কগাছ। আরে সর্ব্বনাশ! এ যে গতকল্যকার সেই হাজিরা-অপহৃত, ক্লাস হইতে বহিষ্কৃত ছাত্রটি। ইহাদেরই বাড়ী নাকি? ছেলেটি নগ্নগাত্রে রেলিঙ ঝুঁকিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। সে কী তাহার বুকের ছাতি, কী পেশল বাহুদ্বয়ের মাংসপেশী! কর্ম্ম সারিয়াছে আর কি! আমাকে দেখিবামাত্র যেরূপ তৎপরতার সহিত সে গৃহাভ্যন্তরে পুনঃপ্রবেশ করিল, তাহাতে সন্দেহমাত্র রহিল না, মুহূর্ত্ত মধ্যেই গুণ্ডা ছেলেটা রাস্তায় নামিয়া আসিবে। মারিবে নাকি? মারিবে না, কি ছাড়িয়া দিবে? আলবৎ

মারিবে। মারিয়া লাশ গুম করিয়া ফেলিবে। গতকল্য এতগুলি ছাত্রীর সম্মুখে বিনা কারণে তাহাকে যে অপমানটা করিয়াছি, তাহার প্রতিশোধ লইবে না? অধ্যাপকেরা চালাকি পাইয়াছে নাকি? ছাত্রদেব মান-সম্মান নাই? দোষের মধ্যে হাজিরা ডাকিবার সময় একটু বিকৃত স্বরে উপস্থিতি জ্ঞাপন করিয়াছিল। তাহাতে হইয়াছিল কি? আমারই বা এমন কি বীণানিন্দিত কণ্ঠস্বর? অথচ উহা লইয়াই তো দিনের পর দিন, ঘণ্টাব পর ঘণ্টা, বেচারীদের জ্বালাইয়া মারিতেছি। কই, উহারা তো কেহ কোনোদিন আমাকে ক্লাস হইতে বাহির করিয়া দেয় নাই? যদি দিত তাহা হইলে করিতামই বা কি, বলিবারই বা থাকিত কি?

কিন্তু ভাবিবার সময় ছিল না। সিঁড়িতে ছেলেটির পদশব্দ শোনা যাইতেছে। আর বিলম্ব করা উচিত হইবে না। পলায়ন কবিতে হইলে এই বেলা। ছাতিটি গুটাইয়া সম্মুখে গলির ভিতর দিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিলাম। কোনোদিকে দৃক্‌পাত করিবার অবকাশ ছিল না। বুঝিলাম, এই ধাবমান প্রবীণ ভদ্রলোকটির প্রতি অনেকেই অবাক হইয়া তাকাইয়া আছে। তা থাকুক। তাহারা তো আর ক্লাস হইতে ছাত্র বহিষ্কার করে নাই, তাহারা বুঝিবে কি?

ছুটিতে ছুটিতে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া ভাগ্যক্রমে একটি রিক্‌শ জুটিয়া গেল। লাফাইয়া উঠিয়া বলিলাম, চালাও।

বাসায় পৌঁছিয়াও বুকের কাঁপুনি থামে না। ধপাস্ করিয়া খাটের উপর শুইয়া পড়িলাম। গৃহিণী বুঝিলেন,

রৌদ্রে রৌদ্রে বাড়ীর সন্ধানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া ফিরিয়াছি। দৌড়িয়া আসিয়া কপালের ঘাম অঞ্চলে মুছিয়া বাতাস করিতে লাগিলেন।

অর্দ্ধ ঘণ্টাখানেক অচৈতন্যবৎ থাকিয়া হঠাৎ কানে আসিল, গৃহিণী বলিতেছেন, ছাখো, আর্ম্মানীটোলায় নাকি একটি বাড়ী খালি আছে। শুনিবামাত্র পুনরায় বিভীষিকা দেখিতে লাগিলাম। নিদ্রাজাগরণের অন্ধকারে মনে হইতে লাগিল, আর্ম্মানীটোলার খালি বাড়ীটির এক বাতায়নে বসিয়া গতকল্যকার টিউটোরিয়াল ক্লাসের সেই সি-মাইনাস-পাওয়া ক্রন্দসী ছাত্রীটি। বাড়ীটির সম্মুখে লোকে লোকারণ্য। কন্যাটির ভ্রাতৃবৃন্দ এবং প্রেমিক-বাহিনী আমাকে চ্যাং-দোলা করিয়া হাসপাতালের দিকে লইয়া যাইতেছে।

শিউপূজন

অফিসে আসিয়া অবধি অত্যন্ত তৃষ্ণা বোধ হইতেছিল। একে গরম, তাহার উপর ফ্যান্‌টা অচল হইয়া রহিয়াছে। ঘামিয়া একেবারে অস্থির। ইলেক্‌ট্রিক ডিপার্টমেণ্টে দুই দিন যাবং খবর গিয়াছে, অথচ পাখাটা এ যাবং মেরামত হইল না। জলের কুঁজাটা আবার ঘরের আর এক কোণে কে সরাইয়া রাখিয়াছে। উঠিয়া গিয়া এক গ্লাস জল গড়াইয়া খাইবার পরিশ্রমটুকুও যেন সহ্য হয় না। চেয়ারে এলাইয়া পড়িয়া চাপরাসীর উদ্দেশ্যে হাঁকিলাম, মহাবীর!

মনে করিবেন না, আমি অফিসের একজন পদস্থ কর্ম্মচারী। আমি এক বিশ্ববিদ্যালয়ে কেরানীকুলের অন্যতম। বেতন পঁচাশি টাকা। ইহা হইতে মাসে মাসে প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের ধার শোধ দিতে হয়। ঘরে যাহা আসে, তাহার পরিমাণটা মা-ই শুনিলেন। গলা সর্ব্বদা শুকাইয়াই আছে। তদুপরি গরমটা হঠাৎ বেশি পড়াতে তৃষ্ণা যেন আজ একটু বাড়িয়া গিয়াছে।

মহাবীর! এই মহাবীর! মহাবীরের সাড়াশব্দ নাই। ব্যাটা নিশ্চয়ই ঢুলিতেছে, কিংবা বাহিরে গিয়া খৈনি টিপিতেছে। বিরক্ত হইয়া উঠিয়া পড়িলাম। ঢকঢক করিয়া দুই গ্লাস জল খাইয়া ধূমপানের উদ্দেশ্যে ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলাম। মহাবীর, দেখিলাম, স্বস্থানেই

উপবিষ্ট, এমন কি নিদ্রাবিষ্টও নহে। একখানি কাগজ লইয়া অত্যন্ত নিবিষ্ট চিত্তে কী যেন লিখিতে ব্যস্ত। এঃ, বাবুর আবার লেখাপড়া হইতেছে! এম, এ, পাস করিয়া ব্যাটা প্রফেসর হইবে! হতভাগা কোথাকার! কাছে গিয়া দাঁড়াইলাম, তথাপি হুঁশ নাই। ধমকাইয়া উঠিলাম, এই মহাবীর! ধ্যানী বুদ্ধের যেন ধ্যানভঙ্গ হইল। কাগজ-পেন্সিল গুটাইয়া অন্যমনস্কভাবে আমার দিকে চাহিয়া বলিল, কি বোলছেন?

আবে, বলছি আমার মাথা! বলি, তোকে ডেকে ডেকে সাড়া পাই না কেন? বিস্তেটা না হয় বাড়ীতে ব'সেই ফলালে? আহাম্মক কোথাকার!

আরো কিছু দুর্ব্বাক্য প্রয়োগের ইচ্ছা ছিল। কিন্তু ইহাতেই মেজাজটা বেশ পাতলা হইয়া গেল। সুতরাং আর বাক্যব্যয় না করিয়া বাহিরের বারাণ্ডার দিকে অগ্রসর হইয়া গেলাম। মহাবীর পুনরায় কাগজ পাড়িয়া বসিল।

বিড়িতে সবে দুইটা টান দিয়াছি, এমন সময় খোদ বড় সাহেবের চাপরাসী আসিয়া খবর দিল, সাহেব ডাকিতেছেন। ধূমপান মাথায় উঠিল। হন্তদন্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ বড় সাহেবের কামরার উদ্দেশ্যে ছুটিলাম। বুকটা ধড়ফড় করিতে লাগিল। আমার পক্ষে বড় সাহেবের সেলাম পাওয়া এক মহা দুর্ভাগ্য। সত্য বলিতে কি, তাঁহার ইংরেজী আমি এক বর্ণ বুঝি না। একবার ডাকিয়া স্টেশনারির হিসাব চাহিয়াছিলেন। আমি মনে করিলাম,

স্টেশনে যাইতে হইবে। কিন্তু কি উদ্দেশ্যে, সেটুকু জানিয়া লইবার সাহস হইল না। স্টেশনে গিয়া বিনা কর্মে ঘণ্টা দেড়েক বিড়ি ফুঁকিয়া, রেলওয়ে টাইম-টেবিল মুখস্থ করিয়া অফিসে ফিরিলাম। এদিকে সাহেব আমার অপেক্ষায় বসিয়া আছেন, অথচ আমাব পাত্তা নাই। অফিসময় সে এক মহা হুলস্থূল কাণ্ড!

দুই-তিনটি লম্বা করিডরের দুই ধার জুড়িয়া আমাদের অফিস। এক-একটি ঘরে এক-একটি ডিপার্টমেণ্ট। প্রতি ডিপার্টমেণ্টে একজন বড়বাবু, দশ-বারোটি কেরানী এবং দুই-তিনটি চাপরাসী। চাপরাসীরা বাহিরে বেঞ্চ পাতিয়া বসে। ঘণ্টাধ্বনি কিংবা কণ্ঠধ্বনির ডাক আসিলে আহ্বানকারীর পদমর্য্যাদা অনুসারে দ্রুত কিংবা মন্থর গতিতে হাজিরা দেয়। তারতম্য-জ্ঞান ইহাদের ভয়ানক প্রখর। বড় সাহেবকে দেখিলে সমস্ত করিডরের যাবতীয় চাপরাসী একযোগে উঠিয়া দাঁড়ায় এবং শীর্ষদেশ যথাসম্ভব অবনত করিয়া সেলাম জানায়। ছোট সাহেবের বেলাতেও তাই, কেবল মেরুদণ্ডের বঙ্কিম রেখার ঝোঁকটি যেন অতখানি নিম্নমুখী হয় না। বড়বাবুরা কেহ সেলাম পান না, তবে কাছে আসিলে সকলেই সসম্মানে উঠিয়া দাঁড়ায়। কেরানীরা অবশ্যই গ্রাহ্যের বাহিরে। তাঁহাদের দেখিলে কদাচিৎ কেহ উপবিষ্ট অবস্থাতেই মুখে সেলাম বলিয়া মানরক্ষা করে। অধ্যাপকগণের মধ্যে যাঁহারা উচ্চপদস্থ, তাঁহারা প্রায় বড় ও ছোট সাহেবের তুল্য সম্মান পাইয়া

থাকেন। যে-সকল অধ্যাপকের পদমর্য্যাদা নাই, কিন্তু অর্থমর্য্যাদা আছে, অর্থাৎ যাঁহারা যে-কোনো দিন কর্তৃপক্ষের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারেন, তাঁহারা ইহাদের নিকট সম্ভ্রমে বড়বাবুদের সমকক্ষ। যাঁহাদের পদ কিংবা অর্থ কোনো মর্য্যাদাই নাই, তাঁহাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত প্রবীণগণকে দেখিলে ইহারা একটু নড়িয়া-চড়িয়া বসে। পরন্তু যাঁহাদের সেটুকু বয়সের দাবিও নাই, তাঁহাদের কাছে পাইলে ইহারা বিড়িতে অগ্নিসংযোগ করে, কিংবা পা মাটিতে নামানো থাকিলে তুলিয়া বসে।

লম্বা করিডরের এক প্রান্তে আমার আস্তানা, অন্য প্রান্তে বড় সাহেবের কামরা। সাহেবেব তলবে দ্রুত হাঁটিয়া চলিয়াছি। এ সময় বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইয়া থাকিবারই কথা। কিন্তু নিতান্ত অদ্ভুত এবং অস্বাভাবিক বলিয়াই জীবন-মৃত্যুর এমন সন্ধিক্ষণেও একটি জিনিস চোখে পড়িল। মহাবীরের ন্যায় সমস্ত চাপরাসীরই আজ যেন কি হইয়াছে। প্রত্যেকে যে যাহার স্থানে বসিয়া অতি মনোযোগ সহকারে লম্বা লম্বা কাগজে—কেহ ঘচ্‌ঘচ্‌ করিয়া, কেহ খস্‌খস্‌ করিয়া কেহ বা ফস্‌ফস্‌ করিয়া—অনবরত লিখিয়া যাইতেছে। রেকর্ডস্‌ ডিপার্টমেণ্টের চাপরাসী বাবুলাল পেন্সিলটাকে কামড়াইয়া ধরিয়াছে। লিখিতে লিখিতে উহার চিন্তার ফ্লো কোথাও আটকাইয়া গিয়া থাকিবে। পাশের দরজায় মেহের আলি রিভাইস্‌ করিতে ব্যস্ত। ইহাদের আজ হইল কি? কোনো পরীক্ষা হইতেছে নাকি? কিসের পরীক্ষা?

না, সকলে মাগ্‌গি ভাতার দরখাস্ত লিখিতেছে? কিছুই বুঝিতে পারা গেল না। বুঝিবার সময়ও ছিল না। দ্রুত পদক্ষেপে বড় সাহেবের ঘরে ঢুকিয়া পড়িলাম।

বাহির হইয়া আসিয়া ভাবিলাম, ব্যাপারটা কি জানিতে হইবে। কৌতূহলী হইয়া বাবুলালের দিকে অগ্রসর হইলাম। আমি নিকটে আসিতে সে কাগজপত্র সম্বরণ করিতে ব্যস্ত হইয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, কিসের দরখাস্ত লিখছিস্ রে তোরা?

বাবুলাল হাসিল। বলিল, দরখাস্ত্ না আছে।

তবে কি আছে?

বাবুলাল নিরুত্তর। মুখমণ্ডল লজ্জা এবং ঈষৎ কুণ্ঠার অভিব্যক্তি। অনেক চেষ্টা করিলাম, অনেক সাধ্যসাধনা। কিন্তু কোনো কথা বাহির করিতে পারা গেল না। আরো দুই-চারিজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম। সকলেরই ওই এক ভাব। কেহই কিছু বলে না, কেবল হাসে। ব্যাপারটা ঠাহর করিতে না পারিয়া অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ হইতে লাগিল। সহকর্ম্মীদের আসিয়া জানাইলাম। তাঁহারাও এ ব্যাপার লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু কেহই রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে সমর্থ হন নাই।

বৈকালে অফিস হইতে বাসায় ফিরিবার পর হাত-মুখ ধুইয়া চা তৈরি করিতে বসিলাম। আমার একার সংসার। বিপত্নীক হইবার পর আর ঝামেলা বাড়াই নাই। একটি মাত্র ছেলে, সে মাতুলালয়ে অমানুষ হইতেছে। সংসারে

আমি আর শিউপূজন। শিউপূজন সায়েন্স্ ল্যাবেরেটরির চাপরাসী। সে সকালবেলায় চা করিয়া দেয়, বাজার করিয়া আনিয়া রান্না করে, আমার জন্য আহার্য্য প্রস্তুত করিয়া নিজে খাইয়া দশটার মধ্যে ল্যাবরেটরিতে চলিয়া যায়। আবার সন্ধ্যায় বাসায় ফিরিয়া অন্যান্য গৃহকর্ম্ম করে। মাহিনা দিতে হয় না, খাওয়া থাকা ফ্রী। উভয় পক্ষেরই সুবিধা। তাহার পৈতৃক বাস পশ্চিমে এলাহাবাদ অঞ্চলে। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক এখানে যখন চাকুরি লইয়া আসেন, শিউপূজন তখন তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিল। সে-অধ্যাপক দুই বৎসর পরই অন্যত্র চলিয়া যান। শিউপূজন থাকিয়া গিয়াছে।

চা-পানাদির পর বিশ্রাম করিতেছি, এমন সময় শিউপূজন বাসায় ফিরিল। হঠাৎ খেয়াল হইল, আজিকার রহস্যটি উহার নিকট হইতে হয়তো বা বাহির করা যাইতে পারে। রাত্রির আহারের সময় কথাটা পাড়িতে হইবে, মনে মনে মতলব আঁটিয়া বেড়াইতে বাহির হইয়া গেলাম।

যথাসময়ে আহারে বসিয়া ডাকিলাম, শিউপূজন, শুনে যা তো একবার এদিকে। শিউপূজন রান্নাঘর বন্ধ করিয়া ঘরের ভিতর আসিয়া দাঁড়াইল। আসল কথাটা সহসা উত্থাপন করা সমীচীন হইবে বলিয়া মনে হইল না। সুতরাং অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা দিয়া আলাপ আরম্ভ করিলাম। উহার পুত্রকন্যাদির ভবিষ্যৎ, দেশের হাল, জমিজমার ব্যবস্থা ইত্যাদি নানাবিধ ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের অকাতর জলসিঞ্চনে

হৃদয়তট যখন যথেষ্ট সিক্ত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইল, তখন অতি সাবধানে আসল বিষয়টি উত্থাপন করিলাম। পাছে বা বিগড়াইয়া যায়, গলার স্বরে যথাসম্ভব মিনতির আমেজ লাগাইয়া বলিলাম শিউপূজন, একটা কথা বলতে পারিস?

শিউপূজন উত্তর করিল, পুছিয়ে না।

আচ্ছা, আজ দেখলাম, অফিসের যত চাপরাসী সবাই মিলে কাগজ পেড়ে খুব ঘস্‌ঘস্‌ ক'রে কি সব লিখছে। লিখছে তো লিখছেই, কারুর আর মাথা তোলবার ফুরসৎ নেই। জিজ্ঞেস করতে কেউ কিচ্ছু বললে না। ব্যাপারটা কি, বল দিকিনি। এত লেখাপড়া কিসের? তুই কিছু জানিস?

শিউপূজনের মুখের ভাব হঠাৎ বদলাইয়া গেল। কিছুক্ষণ নিরুত্তর থাকিয়া শেষে বলিল, না বাবু, হাঁমি কিছু জানি না। কিন্তু উহার চেহারা উহাকে ধরাইয়া দিয়াছে। বেশ বুঝিলাম, ও সবই জানে। খুব খানিকক্ষণ কষিয়া চাপিয়া ধরিতে হইল। ব্যাটা কিছুতেই কথা বাহির করিতে চায় না। কেবল বলে, কিছু জানি না। আমিও নাছোড়বান্দা। জেদ চাপিয়া গেল, উহার নিকট হইতে কথাটা আদায় করিবই।

বহু সাধ্যসাধনার পর অবশেষে শিউপূজন টলিল। বলিল, হাঁমি বলবে, মগর হাঁমি কৌন শক্‌স্‌ আছে ছিপাকে রাখতে হোবে।

আরে, এ আর একটা কথা কি? নিশ্চয়ই।—তৎক্ষণাৎ প্রতিশ্রুতি দিলাম।

শিউপূজন বলিল, উহারা থীসিস লিখিতেছে।

অ্যাঁ? কি লিখছে?

থীসিস।

থীসিস? পাগলের মতো কী বলছিস?

হাঁমি ঠিক বোলছে।

মাথায় একটা বাড়ি খাইয়া যেন বসিয়া পড়িলাম! হতভাগা বলে কি? চাপরাসীরা থীসিস লিখিতেছে? থীসিস লিখিতেছে—চাপরাসীরা! চাপরাসীরা লিখিতেছে—থীসিস! উল্টাইয়া পাল্টাইয়া যে ভাবেই দেখি, মাথা ঘুলাইয়া যায়। এ যে স্বপ্নেরও আগোচর! আমিই ভুল শুনিতেছি, না, শিউপূজনই আমার সহিত রহস্য করিতেছে? উত্তেজিত হইয়া প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিতে লাগিলাম। উত্তরে শিউপূজন এক অপূর্ব্ব কাহিনী বিবৃত করিল। সে কাহিনী আপনারাও শুনুন।

আগামী বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিশনেয়ার অবসর লইলে তাহার চাকুরিটি খালি হইবে। এই পদটি অত্যন্ত লোভনীয়। চাপরাসী, দরোয়ান, পিয়ন সর্ব্বসমন্বয়ে যে গোষ্ঠিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত আছে, তাহাদের সর্ব্বময় কর্ত্তা এই কমিশনেয়ার। বেতন পঁয়তাল্লিশ টাকা, তদুপরি ফ্রী কোয়ার্টার। কর্ম্মের মধ্যে চাপরাসী-সম্প্রদায়ের উপর ছড়ি ঘোরানো এবং কর্ত্তৃপক্ষের তাঁবেদারি করা।

কিন্তু শিউপূজন লক্ষ্য করিয়াছে, ইদানীং পি-এইচ. ডি. টি-এইচ. ডি. না হইতে পারিলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে কাহারো আর চাকুরি হইতেছে না। হইবার কথাও নয়। কাজকর্ম্ম কিছু না করিয়া কেবল ঘোড়ার ঘাস কাটিলেই কি জীবনে উন্নতি হয়? জহুরের অবশ্য সব কিছুতেই পরিহাস, সে বলে, যাহা শিখিয়াছি তাহারই দাম আগে দিয়া লউক। শিউপূজন এই ঔদ্ধত্যের সম্পূর্ণ বিরোধী। আরে জনাব, আপ যো কুছ শিখ্‌খা হ্যায় উস্‌কা সবুৎ কঁহা? কঁহী ছপ্‌কে কুছ নিক্‌লা ভি তো হ্যায়—সহি? ফুটনোট ক্যা হ্যায় বাতাইয়ে তো? আই বিড কৌন্‌ চিজ হ্যায় কহিয়ে তো? তুম তো শিখ্‌খা হ্যায় জরুর বোলো গে। লেকিন ইয়হ্‌ মুঝে কিস্‌ তরহ্‌ ইয়াকিন্‌ হো সকতা? সুতরাং সমস্ত দিক বিবেচনা করিয়া শিউপূজন গত বৎসর হইতে অতি গোপনে এক মৌলিক গবেষণায় প্রবৃত্ত হইয়াছে, এবং তাহার কাজ এই এক বৎসরের মধ্যে বেশ কিছুদূর অগ্রসরও হইয়া গিয়াছে। কিন্তু ইতিমধ্যে একদিন অতর্কিতে কথাটা ফাঁস হইয়া যাওয়াতে সমগ্র চাপরাসী-মহল সচকিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহারও প্রত্যেকে, অবশ্য জহুর ব্যতীত, শিউপূজনের দেখাদেখি থীসিস রচনা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। তবে, শিউপূজনের বিশোয়াস, উহারা শুরু করিতেই এত বিলম্ব করিয়াছে যে, পূরা থীসিস লেখা কাহারো হইয়া উঠিবে না। বড় জোর দুই-তিনটি করিয়া পেপার ছাপাইতে পারিবে। শিউপূজন ইত্যবসরে পি-এইচ. ডি. হইয়া যাইতে পারিলে এ চাকুরি তাহার অবশ্যম্ভাবী।'

এমন কাহিনী কে কবে শুনিয়াছে ? স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া বসিয়া যন্ত্রচালিতের ন্যায় অন্ন ব্যঞ্জন উদরস্থ করিতে লাগিলাম এবং ঢোকে ঢোকে জল খাইতে লাগিলাম। ধাক্কাটা সামলানো সহজ নয়। বিস্ময়ের প্রথম ঘোরটা কাটিবার পর মনে হইল, শিউপূজন কিন্তু বুদ্ধিটা ঠাওরাইয়াছে অতি উত্তম। ডিগ্রীটা লইতে পারিলে তাহার এই উচ্চ আকাঙ্ক্ষা নিশ্চয়ই পূর্ণ হইবে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিস্তীর্ণ পরিবেশের মধ্যে দিবারাত্রি থাকিতে থাকিতেই না উহার চরিত্রের এতখানি উন্নতি হইয়াছে। অথচ কি আশ্চর্য্য, আমাদের মধ্যে কাহারো মনে এ ধরণের চিন্তা কোনোদিন উদয় হয় নাই। চাপরাসীমহলের এই উদ্যমের সংবাদ শুনিয়া কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই ভূয়সী প্রশংসা করিবেন।

আহারের পর শিউপূজন তামাক দিতে আসিল। বলিলাম, শিউপূজন, তোর লেখাটা আমায় দেখাবি ? সে যেন একটু উৎসাহিত হইয়া উঠিল। বলিল, হাঁ, জরুর, লেকিন লিখ্‌খা খতম না হয়েছে, আভি কাফি মেহনৎ বাকী রোয়েছে। বলিলাম, বেশ তো, আমিও না হয় তোকে একটু আধটু সাহায্য করব। প্রফেসরদের মধ্যে দুজন পি-এইচ, ডি, আমার দোস্ত, তাঁদের দিয়েও সাহায্য করানো যাবে।

শিউপূজন চকিতে ঘর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নিমেষমধ্যে থীসিসখানি লইয়া ফিরিল। দেখিলাম, সে এক রাজসূয় ব্যাপার। টাইপ অক্ষরে ফুলস্ক্যাপ কাগজের অন্তত আড়াইশো পাতা হইবে। শিউপূজন বলিল, কাজটা মোটামুটি হইয়া

গিয়াছে। লেকিন পূরা লিখ্‌খা এক দফে আউর দেখনা বাকি আছে। থোড়া বড়ে বড়ে কিতাবসে মিলানা ভি আছে। সব জোড়্‌কে আব দো মাহিনেকি কাম রহা।

সমস্ত রাত্রি জাগিয়া বিস্ময় ও কৌতূহলে অভিভূত হইয়া থীসিসখানি আদ্যোপান্ত পড়িয়া ফেলিলাম। এমন আগ্রহ-সহকারে কখনো কিছু পাঠ করিয়াছি বলিয়া মনে পড়ে না। তথ্য এবং সূক্ষ্ম বিশ্লেষণপূর্ণ এমন একখানি অভিনব ও কুশলী রচনা আমার চোখে পড়ে নাই। অবশ্য আমি সামান্য কেরানী, আমার জ্ঞানই বা কি, বিচারশক্তিই বা কতটুকু? গবেষণার বিষয়টি হইল থিওরি অফ গেট্-কিপিং উইথ স্পেশ্যাল রেফারেন্স টু ইণ্ডিয়া। পরিচ্ছেদ-বিভাগটি অতি সুচিন্তিত। বিষয়টি যে এত বিভিন্ন দিক হইতে আলোচনা করা যায়, অর্থাৎ, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় জ্ঞান-কটাহের অভ্যন্তরেই যে ইহার অস্থি-চর্ম্ম মেদ-মাংসাদি গুমিয়া গুমিয়া সিদ্ধ হইতেছে, কে কবে জানিত? শিউপূজন প্রতিটি কটাহের ঢাকনি উদ্ঘাটন করিয়া লইয়া কিছু কিছু আড়াইশো পাতে পরিবেশন করিয়া রাখিয়াছে। সিনপ্-সিস্‌টি আপনাদের উপহার দিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিলাম না।

প্রথম পরিচ্ছেদ … ইণ্ট্রোডাক্‌শন্ য়্যাণ্ড প্ল্যান

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ … সাম্ থিওরিস্ অফ্ গেট-কিপিং একজামিন্‌ড্: আরিষ্টটল, ম্যাকিয়াভেলি, কার্ল মার্ক্স।

পড়িয়া মুগ্ধ হইলাম। নয়টি পরিচ্ছেদ যেন নবরত্নের মালা—বীণাপাণির বরমাল্য। শিউপূজনের মধ্যে এতখানি দিগ্বিজয়ী পাণ্ডিত্য লুকাইয়া আছে, কে ভাবিতে পারিয়াছিল? পাতায়-পাতায় ফুটনোট, পৃষ্ঠায়-পৃষ্ঠায় কোটেশন (কোটেশনের বেগই বা কী ভয়ঙ্কর! একবার শুরু হইল তো দশ-বিশ পৃষ্ঠা গড়াইয়া গিয়া তবে শেষ হইল!), প্রতি পরিচ্ছেদে ফর্ম্মুলা, ষ্ট্যাটিস্টিক্স, গ্রাফ—সে এক রোমহর্ষক কাণ্ড! ভোর না হইতে শিউপূজনকে ঘুম হইতে ডাকিয়া তুলিয়া দুই হাত চাপিয়া আবেগভরে বলিলাম, শিউপূজন, তুই ধন্য, তুই কেল্লা মারিয়াছিস।

কথাটা রাষ্ট্র হইতে বেশিদিন লাগিল না। সকলে শুনিয়া শিউপূজন ও গবেষণাপ্রবৃত্ত যাবতীয় চাপরাসীবৃন্দকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। ইহাই তো চাই! ইহা না হইলে আবার মনুষ্য! অধ্যাপকদের মধ্যে যাঁহারা পি-এইচ. ডি. নন, তাঁহারা লজ্জায় অধোবদন হইলেন, যাঁহারা ডিগ্রিধারী, তাঁহার চাপরাসীদের সমান সমান হইয়া

পড়িবার আশঙ্কায় মনে মনে বিচলিত বোধ করিতে লাগিলেন।

শিউপূজনের অপূর্ব্ব উপাখ্যান যদি এখানেই শেষ করিয়া দিই, তাহা হইলে আপনারা নিশ্চয়ই আমার উপর রুষ্ট হইবেন। উহার ডিগ্রিটা হইল কি না, চাকুরিটা জুটিল কি না এ সকল জানিতে না পারিয়া অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করিতে থাকিবেন। অথচ পরবর্ত্তী ইতিহাসটা নিতান্তই মামুলি, বৈচিত্র্যের নামগন্ধ নাই। সুতরাং সংক্ষেপে বলিতে চেষ্টা করিব।

যথাসময়ে শিউপূজন তাহার থীসিস পেশ করিল। পরীক্ষক নিযুক্ত হইলেন কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক পরিষদের ইংরেজ দ্বারপাল মিঃ হিলবর্ন, হায়দ্রাবাদ নিজামের রাজ-প্রহরী মহাব্বাত খাঁ এবং মহাত্মা গান্ধীর দেহরক্ষক পাহ্‌লোয়ান ভীমপরসাদ। শেষোক্তকে লইয়া মুসলমান সদস্যদের মধ্যে আপত্তি হইয়াছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত টিকে নাই।

ওদিকে শিউপূজন যাহা বলিয়াছিল, তাহাই সত্য হইল। চাপরাসীদের মধ্যে অন্য কেহ থীসিস প্রস্তুত করিতে সমর্থ হইল না। তাহারা প্রায় সকলেই নানা সাময়িক পত্রে দুই-চারিটি করিয়া পেপার ছাপাইতে পারিল মাত্র। কেবল অর্থনীতি ডিপার্টমেণ্টের চাপরাসী ফেকন বিলাতের কোয়ার্টর্লি জার্নাল অফ গেটকিপিং নামক পত্রিকায় একখানি

সারগর্ভ প্রবন্ধ ছাপাইয়া একটু উপরি-বাহাদুরি দেখাইল। উহার বিষয়, ইণ্ডিফারেন্স্ কার্ভ্স্ ইন দি ফেশ্যাল্ এক্সপ্রেশন্স্ অফ চাপরাশিস্।

শিউপূজন ডিগ্রি পাইবার কিছুকাল পর কমিশনেয়ারের পদ খালি হইল। যথাসময়ে আবেদনপত্র আমন্ত্রণ করা হইল এবং নির্ব্বাচন-কমিটিও নিযুক্ত হইয়া গেল। কমিটির সুপারিশে প্রথম নাম গেল শিউপূজন এবং দ্বিতীয় নাম বড় সাহেবের চাপরাসী কেরামত আলি। কার্য্যনির্ব্বাহক সিণ্ডিকেট ভোটাধিক্যে দ্বিতীয় প্রার্থীকে মনোনয়ন করিলেন, যদিও কাজকর্ম্ম সে বিশেষ কিছুই করে নাই।

শিউপূজন ব্যর্থ হইয়াও হাল ছাড়ে নাই। ইহার কারণ, কেরামত আলি প্রথম মেয়াদে মাত্র দুই বৎসরের জন্য নিযুক্ত হইয়াছে। অতঃপর পুনরায় নূতন করিয়া আবেদনপত্র আমন্ত্রণ করা হইবে। ইত্যবসরে একটু ফিল্ড ওআর্ক দেখাইয়া ডি. লিট, হইয়া লইতে পারিলে আর কোনো কথাই থাকিবে না—শিউপূজনের এই বিশ্বাস। সে এখন সেই ফিল্ড ওঅর্ক-এ প্রবৃত্ত হইয়াছে।

জহুরের সব কিছুতেই পরিহাস। সে বলে, অর্থাৎ ঘোড়ার ঘাস কাটিতে নামিয়াছে।

দিল্লিতে

দিল্লিতে আছি কেমন? মন্দ কি, আছি ভালোই। স্বাধীন দেশের শীর্ষস্থানে বসিয়া আছি, নয়া দিল্লির বৃত্তাভ্যাস এখন সহজ হইয়া আসিয়াছে; চক্রে পা পড়িলে চক্রান্ত বাহির করিতে কষ্ট হয় না, অনায়াসেই মুক্ত হইয়া বাড়ী ফিরিতে পারি। প্রথম যখন আসিয়াছিলাম, বাংলা দেশের কথা ভাবিয়া বড় বিচলিত বোধ করিতাম। ইদানীং সেই দুঃখের সূচীমুখও প্রায় ভোঁতা হইয়া আসিয়াছে, মনটা অতখানি হাহাকার করে না। তাছাড়া, আত্মীয়-বন্ধু সম্প্রদায়ের সভ্যগণ মাঝে-মাঝেই বঙ্গীয় দিগন্ত হইতে উদয় হইতেছেন,—কেহ বেড়াইতে, কেহ চাকুরির সন্ধানে, কেহ বা যুগ্ম অভিপ্রায়ে।

প্রিয়জন-সংযোগ চিরকালই আনন্দের। ইহাদের অভ্যাগমন বার্ত্তা জানিবামাত্র স্টেশনে গিয়া উপস্থিত হই, টাঙ্গায় চড়াইয়া বাড়ীতে লইয়া আসি, বাড়ীতে আনিয়া আদরে আপ্যায়নে অভিভূত করিতে চেষ্টা করি। বহুদিন পর এক এক জনের সঙ্গে দেখা, কত কথা কতদিন ধরিয়া জমিয়া থাকে, বলিয়া-বলিয়া শুনিয়া-শুনিয়া তাহা আর ফুরায় না। যিনি যখনই আসেন, দিনকয়েক আনন্দ-সাগরে আকণ্ঠ ডুবিয়া থাকি।

কিন্তু—শুনিয়া যেন চমকাইয়া উঠিবেন না—আনন্দটা

অমিত হইলেও ঠিক অমিশ্র নয়। ইহারা কেহ আসিতেছেন শুনিলে সমস্ত মন জুড়িয়া আনন্দের সঙ্গে-সঙ্গে একটা আশঙ্কাও আন্দোলিত হইয়া ওঠে। আশঙ্কার রূপটি নেহাৎ অজানা হইলে হয়তো অতখানি পীড়াবোধ হইত না। কিন্তু এ আশঙ্কা সে-পর্য্যায়ের নয়, বরং নিতান্তই স্পষ্ট, প্রত্যক্ষ এবং নির্দ্দিষ্ট। ধরুন, চিঠিতে জানা গেল, নববিবাহিতা শ্যালিকা নবলব্ধ স্বামী সহ দিল্লি বেড়াইতে আসিতেছেন। আপনারা বলিবেন, এ তো একেবারে সোনায় সোহাগা। একে প্রিয়জন, তদুপরি শ্যালিকা, দেখা না হওয়া পর্য্যন্ত ছট্‌ফট্‌ করিবার কথা। আমিও ঠিক তাহাই বলি। কিন্তু উহা বলিতে-বলিতেই আরেক কথা মনে উদয় হইয়া যায়—আবার কুতুবমিনার দেখিতে যাইতে হইবে। অবশ্যই যাইতে হইবে, কোনো অজুহাত কেহ মানিবে না, শ্যালিকা হাত ধরিয়া টানাটানি করিবে, শ্যালিকাপতি সৌজন্যবিচ্ছুরিত অনুরোধের ভঙ্গী হানিয়া বলিবেন, 'আপনার কাজের ব্যাঘাত না হয় তো চলুন না একবার ঘুরে আসি,' গৃহিনী বলিবেন, 'আহা, কাজ না হাতী।' সুতরাং নিতান্তই অবধারিত, আবার কুতুবমিনার দেখিতে যাইতে হইবে। ইতিপূর্ব্বে উনিশ বার দেখা হইয়া গিয়াছে, এইবার কুড়ি পূর্ণ হইবে।

কুতুবমিনার দেখিতে আমার এত আপত্তি কেন? সে-কথা বুঝাইয়া বলিতে হয়। আমি-যে অতিথি-বিরূপ নই তাহা আগেই বলিয়াছি। তাঁহাদের সুখসাচ্ছন্দ্য বিধানে আমার কার্পণ্য নাই, বরং উৎসাহ প্রচুর। কিন্তু ইহা

সত্ত্বেও কুতুবমিনার দেখিতে যাইতে আমার ঘোরতর আপত্তি আছে। অনেকে অনুরোধ জানাইয়া বলেন, চলুন না, একটু হৈ হৈ করিয়া আসা যাইবে। এই হৈ-হৈ টা প্রথমতঃ আমার স্বভাব বিরুদ্ধ, হৈ হৈ ওয়ালাদের সঙ্গে আমার মনের মিলই নাই। ঘরে বসিয়া আড্ডা হোক, প্রচুর চায়ের সহিত প্রচুরতর ধূমের সমারোহ হোক, আমি উত্তোগী হইয়া অগ্রসর হইব; সাহিত্য চর্চ্চা, পরচর্চ্চা রাজনীতি কিংবা অর্থনীতির আলোচনা হোক, আমি অগ্রণী হইয়া আসন গ্রহণ করিব। কিন্তু কুতুবমিনারে যাইতে আমি রাজী নই। প্রধান কথা, আমার স্থাপত্য কিংবা ইতিহাস-জ্ঞান অতি পরিমিত ও অস্পষ্ট, এবং আমি মনে করি, অনৈতিহাসিক ও অশিক্ষিত চোখে কুতুবমিনার একবার দেখা-ই যথেষ্ট। শ্যালিকা এবং শ্যালিকাপতি হয়তো এই একবারই দেখিবেন। কিন্তু আমাকে এই লইয়া কুড়িবার দেখিতে হইবে, আমার বিশেষ আপত্তি এখানেই। যে জিনিস চোখে দেখিবার বেশি দেখি না, তাহার বারম্বার বিড়ম্বনা। আপনি যদি চোখের বেশি দেখাইতে পারেন, আপনার সহিত যাইতে রাজী আছি। কিন্তু আপনি যদি অন্ধ হন, আমার মতো আরেকটি অন্ধের তাহাতে উৎসাহ কী হইতে পারে? আপনি দেখিয়া বলিবেন, বা-ব্বাঃ কী উঁচু, আমিও বলিব, সত্যি, কী উঁচু। কিন্তু ঐ পর্যান্তই। একটি উঁচু পদার্থ একবার দেখিবার হয়তো বা অর্থ আছে। বার বার নিরর্থক। অনেকে অবশ্য দেখার বেশিও

অগ্রসর হন, অর্থাৎ, উহার মাথায় চড়িয়া নাম খোদাই করিয়া আসেন। তারপর বাড়ীতে ফিরিয়া ফুস্‌ফুসের কম্পিটিশনে কে কতদূর উঠিয়াছিলেন তাহা লইয়া মহা কলরব। কুতুবমিনার অবশ্যই ব্যায়ামের জন্য তৈরী হয় নাই। কিন্তু উপায় কী? যে বন্দুক ছুঁড়িতে জানে না, সে বন্দুক দিয়া লাঠি খেলে।

আপনি হয়তো মনে-মনে হাসিতেছেন। জিনিসটি ঘরের কাছে হইলে আমার আপত্তি ছিল না, শহর হইতে অত দূরে বলিয়াই যত আপত্তি। দূরত্বটা অবশ্যই উপেক্ষণীয় নয়। যাতায়াতে কুড়ি-পঁচিশ মাইল পথ ধূলি-ধূসরিত হওয়া শরীরের পক্ষে বিজাতীয় বিভূতিভূষণ। কিন্তু, বিশ্বাস করুন, আমার সত্যিকারের আপত্তি সেখানে নয়। আমাকে সেলুন-কারে বসাইয়া লইয়া গেলেও আমি উৎসাহিত হইব না। আনুষঙ্গিক ক্লান্তিটার লাঘব হইবে মাত্র।

কথাটা তাহা হইলে একটু পরিষ্কার করিয়াই বলি। কোনো জিনিস 'দেখা'-টাই চরম নয়। 'দেখা'-র পিছনে বুঝিবারও একটি প্রাসঙ্গিক পরিচ্ছেদ আছে। যদি কেবল দেখিলেন-ই তবে একবার দেখিলেই দেখা শেষ। যদি বুঝিবার পর্য্যায়ে নামিতে পারেন, তবে প্রতিবারের দেখা নূতন করিয়া হইতে পারে। যাহা বুঝি না তাহা দেখিবার সার্থকতা যৎসামান্য, এবং সে-বিবেচনায় না দেখিলেও বিশেষ ক্ষতি নাই। আমি কোনোদিন আর্ট একজিবিশন দেখিতে যাই না। কারণ আমার চিত্রবোধ নাই। কেবলমাত্র

চোখের দৃষ্টিতে যাহা গ্রহণ করিতে পারিব, তাহা তো আর গ্রাহ্য নয়। পঞ্চেন্দ্রিয় আমাদের পাঁচটি ভৃত্য বটে, কিন্তু সেই পঞ্চভৃত্যের নিপুণ পরিচর্য্যা শিক্ষা-সাপেক্ষ। ছবি দেখিলেই ছবি দেখা হয় না।

অথচ কী আশ্চর্য্য, চিত্র-প্রদর্শনীতে চিরকালই অগণিত নরনারীর ভিড়। অনায়াসেই আশঙ্কা করা যায়, কয়েকটি বিদগ্ধজন ব্যতীত, ইহাদের অধিকাংশ চিত্রবোধ শূন্য। একটি দল অবশ্যই সেই হৈ হৈ-সম্প্রদায়ের সভ্য, তাঁহারা রবিবারটা সকলে মিলিয়া একটু হৈ হৈ করিতে আসিয়াছেন। কোনো ছবিতে শারীর মাত্রায়ন অতি 'উদ্ভট', ইঁহারা হাসিয়া অস্থির; কোনোটিতে মনুষ্যমূর্ত্তিটি অবিকল ডুলাঙ্গের পিশেমহাশয়ের মতো,—হাসি আরো উচ্ছ্বসিত। অপর একদল আছেন, তাঁহারা 'কালচার'-তাড়িত হইয়া জুটিয়াছেন। একটি ছবির সম্মুখে ইহাদের একজন স্থির দৃষ্টিতে দণ্ডায়মান। মাঝে-মাঝে এ পাশে ওপাশে দাঁড়াইয়া নানা দৃষ্টিকোন হইতে ছবিটি দেখিতেছেন। একবার হয়তো ঘাড় উঁচাইয়া উবু হইয়া বসিয়াই পড়িলেন। মুখে চোখে সর্ব্বক্ষণ একটি মিশ্র অভিব্যক্তি, তাহাতে আনন্দ আছে, চিন্তা আছে, আবার প্রশ্নও আছে। আসলে অবশ্য কিছুই নাই, মনে-মনে ভাবিতেছেন, যথেষ্টক্ষণ যথাযোগ্য ভঙ্গীতে দেখা হইল তো? প্রদর্শনীর এখানে ওখানে দু'একটি যুবজনের দৃষ্টি ঈষৎ চঞ্চল। কিন্তু চঞ্চল হইলেও খুব সুদূরের পিয়াসী নয়, কারণ কলহাস্য-মুখরিত তরুণীর দলটি অদূরেই।

এই সকল চিত্রামোদীদের কী নামে অভিহিত করা যায়? বলা যায়, এক দল ধর্ম্মহীন, অপর দল ভণ্ড। ভণ্ডামি জিনিসটিও আসলে অধর্ম্মের নামান্তর। সুতরাং ইহারা সকলে এক ধর্ম্মহীন সমাজ, এবং এই ধর্ম্মহীন গোষ্ঠির অন্তর্ভুক্ত হইতে আমার বিন্দুমাত্র উৎসাহ নাই। যিনি সত্যিকারের ধার্ম্মিক তিনি স্বভাবতই পরধর্ম্মে সশ্রদ্ধ। যে ব্যক্তির কোনো ধর্ম্ম নাই, সে-ই সমস্ত ধর্ম্মাশ্রমে মৃগয়া করিয়া ফেরে, অথবা ভণ্ড তপস্বীর বেশে মৃগচর্ম্ম বিছাইয়া বসে।

পরধর্ম্মের প্রতি যে শ্রদ্ধা, তাহা আত্মশ্রদ্ধারই বিকল্প। যে কোনো বিদ্যা, যে-কোনো শিল্প—পারদর্শিতার ক্ষেত্রে বহু নিষ্ঠা ও সাধনা সাপেক্ষ। সে-সাধনায় একটি গোটা জীবন কাটিয়া যাইবার কথা। এক জন্মের আয়ু নিঃশেষ করিয়া কতটুকুই বা জানা যায়। জ্ঞানের অসীমতা ও বিদ্যার বৈচিত্র্য হইতেই অধিকার ভেদের প্রশ্ন ওঠে। আমাদের মতো জনসাধারণের এ বোধ নাই। আমাদের সব কিছুতেই অধিকার, আমরা সবই দেখিয়া ফিরিতেছি।

বাংলা ভাষার দুর্ভাগ্য, আমরা সব কিছুই 'দেখি'। আমরা হিমালয় দেখিতে যাই, হ্যামলেট দেখিতে যাই, আবার, ধরুন, কুস্তিও দেখিতে যাই। অথচ দৃষ্টি ও দর্শনে আকাশ-পাতাল তফাৎ। কুস্তির প্যাঁচ চোখের দেখাতেই সম্পূর্ণ, এবং আমার মতে, ধর্ম্মহীন জনসাধারণের পক্ষে কুস্তি দেখাই প্রকৃষ্টতম চিত্ত-বিনোদন। দিল্লিতে মল্লযুদ্ধের আয়োজন আছে কিনা জানি না। না থাকিলে, পরিবর্ত্তে

ইহাদের জন্য পরবর্ত্তী বিশেষ দ্রষ্টব্য বিড়লা মন্দির। বিড়লা মন্দিরে পাহাড় বানানো হইয়াছে, গুহা তৈরী করা হইয়াছে, নির্ঝরিণী বহানো হইয়াছে; পাথরের হাতী আছে, বাঘ আছে, হনুমান আছে; বাগান আছে, ছবি আছে; অতি সুন্দর দেবমূর্ত্তি, ঝকঝকে শ্বেত পাথরের প্রাঙ্গন, বিরাট প্রাসাদতুল্য মন্দির—লক্ষ লক্ষ টাকার টঙ্কারে দিগ্‌দিগন্ত কাঁপানো বৈভবের মূর্চ্ছনা। ইহার পিছনে না আছে ইতিহাস, না কল্পনা, না সৌন্দর্য্যবোধের বালাই। বিড়লা ভাণ্ডারের একটি হীরকখণ্ড ধনীর রুচিবিকারের ধমকে শতধা বিভক্ত হইয়া হাতী ঘোড়া ও বাঁদরে পরিণত হইয়াছে। বিড়লা মন্দিরে প্রত্যহ হাজার হাজার লোকের ভিড়, ছুটির দিনে লক্ষ লোকের সমাবেশ।

দিল্লিতে আসিয়া, বিড়লা মন্দির থাকিতে, কুতুবমিনারে যাওয়া কেন? কুতুবমিনারের উচ্চতা লক্ষ্য করিতে ঘাড় বিকল হইবে, সিঁড়ি ভাঙিতে দম আট্‌কাইয়া আসিবে। বরং বিড়লা মন্দির ঘুরিয়া আসুন। দেবদেবী দর্শন হইবে, পাশের কালীবাড়ীটাও হইয়া আসিতে পারিবেন, ছেলে-পিলেরা হাতীর গায়ে হাত দিয়া সুখ পাইবে, বাঘের মুখে পড়িয়াও ভয় পাইবে না, মেয়েরা বহু রকমের কাচের চুড়ি কিনিয়া হৃষ্টচিত্তে বাড়ী ফিরিতে পারিবেন।

নেপোলিয়ন

সকাল বেলায় পড়ার টেবিলে বসিয়া অধ্যাপনার মালমশলা সংগ্রহ করিতেছিলাম। পরীক্ষা নিকটবর্ত্তী। ছাত্রগণ অতিমাত্রায় মনোযোগী হইয়া পড়িয়াছে, তদনুপাতে আমাকেও বহুবিধ পাণ্ডিত্য ফলাইতে হইতেছে। গত দিবস ভারতের মুদ্রাস্ফীতি সম্বন্ধে একটি জ্বালাময়ী বক্তৃতার প্রতিশ্রুতি দিয়া আসিয়াছিলাম। তাহারই আয়োজনে ব্যস্ত হইয়া ছিলাম। ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের কারসাজিগুলি একেবারে বেপরোয়াভাবে প্রকাশ করিয়া দিব, মনে মনে ইহাই অভিসন্ধি ছিল।

কোটি কোটি টাকার সমুদ্রে নাক কান ডুবাইয়া বসিয়া আছি। এমন সময় পুত্র আসিয়া ঘোষণা করিল:

"বাবা, আমি নেপোলিয়ন হবো।"

প্রথমে কথাটা খেয়াল করি নাই। কী কৌশলের ফলে এতগুলি করিয়া কাগজী টাকা বাজারে হু হু করিয়া বাহির হইয়া আসিতেছে, তাহারই অনুধাবনে সমস্ত বাহ্য ইন্দ্রিয় রুদ্ধ হইয়া ছিল। সহসা এক মর্ম্মভেদী চীৎকার কর্ণগোচর হইল। ধ্যানভঙ্গে দেখিলাম, আমারই তিন বৎসর বয়স্ক পুত্র আমার শ্রুতি আকর্ষণ নিমিত্ত তারস্বরে ঘোষণা করিতেছে, সে নেপোলিয়ন হইবে।

পুত্রের এবম্বিধ উচ্চাকাঙ্ক্ষায় স্বভাবতঃই পুলকিত

হইলাম। পুত্রটি আপনার হইলে আপনিও হইতেন। হৃষ্টচিত্তে বলিলাম, এ অতি উত্তম প্রস্তাব। তুমি নেপোলিয়ন-ই হইও। আর সত্যই তো, পিতার সংসারে যে অভাব অনটন, নেপোলিয়ন না হইয়া আর উপায় কি?

পাঠে পুনরায় মনোনিবেশ করিলাম। কিন্তু বেশি দূর অগ্রসর হইতে পারিলাম না। অর্দ্ধ মিনিটের মধ্যে খোকন উচ্চতর কণ্ঠে ঘোষণা করিল:

"বাবা, আমি নেপোলিয়ন হবো!"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, বাবা, তাই হ'য়ো, তুমি নেপোলিয়ন হ'য়ো।"

মনে সত্যই বড় আনন্দ হইল। পাড়ার তিন চার বৎসর বয়স্ক কয়টি ছেলে এতখানি উচ্চ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে? হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহাদের দৌড় জানা আছে। বড় জোর হইতে চাহিবে ধ্যানচাঁদ কিংবা ঘোস মহম্মদ! খেলা খেলা করিয়াই তো দেশের ছেলেগুলো জাহান্নামে গেল।

কিন্তু ভবিষ্যতে যে নেপোলিয়ন হইবে, সে সহজে নিবৃত্ত হইবে কেন? পুনরায় পাঠে মনঃসংযোগ করিবার চেষ্টা করিয়া পুনরপি ব্যর্থ হইলাম। খোকন নেপোলিয়ন হইবেই এবং সেই দণ্ডেই।

প্রমাদ গণিলাম। অদ্য এই দণ্ডে তাহাকে কী করিয়া খ্যাতির অতখানি উচ্চশিখরে অধিষ্ঠিত করিয়া দিতে পারা যায় ভাবিয়া পাইলাম না। অথচ আশা ভঙ্গ করিয়া দিবারও ইচ্ছা হইল না। অঙ্কুর একবার যখন ফলিয়াছে, তখন উপযুক্ত জল সেচনাদি করিলে ভবিষ্যতে একটা কাণ্ড

ঘটিবেই। আদর করিয়া নিকটে টানিয়া আনিলাম, এবং এটা-সেটা দেখাইয়া শৈশব জগতের এলাকায় ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। যে-চীৎকারটা আরম্ভ করিয়াছে, প্রশ্রয় পাইলে এই দণ্ডে বাড়ী মাথায় তুলিবে এবং বাড়ীশুদ্ধ সকলের সমস্ত কাজে বিঘ্ন ঘটাইবে। বলিলাম 'খোকন, তুমি সেই বড় বাঁদরটা দেখেছো?" কান্নার পর্দ্দা নামাইয়া অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে খোকন বলিলঃ

'কোন্‌টা?'

'সেই যে কাল বারাণ্ডায় হুপ্ করে এসে নেমেছিল?' একটু চালে ভুল হইয়া গিয়াছিল। হঠাৎ খেয়াল ছিল না, গতকল্য সেই বাঁদরটা পিছন হইতে খোকনের গ্রীবা বেষ্টন করিয়া হস্তধৃত একখানি বিস্কুট ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছিল, এবং এই অতর্কিত আক্রমণের ফলে বিষম ভয় পাইয়া ভবিষ্যৎ নেপোলিয়ন কাঁদিয়া অনর্থ বাধাইয়াছিল। সে-কথা স্মরণমাত্র উহার চীৎকার দশগুণ বৃদ্ধি পাইল, এবং ভারতের মুদ্রাস্ফীতি বিনা প্রতিকারেই সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল।

এমন সময় যে ভয়টা পাইতেছিলাম, তাহাই ঘটিল। রুদ্রমূর্ত্তি ধরিয়া গৃহিণী সশব্দে ঘরে প্রবেশ করিলেন। একেবারে রণরঙ্গিণী বেশ যাহাকে বলে! হুঙ্কার ছাড়িয়া বলিলেন, "ভোর না হতেই কুরুক্ষেত্র বাধিয়েছ? ছেলেটাকে একটু রাখতে পারো না?"—বলিয়াই নিমেষ মধ্যে অপোগণ্ড নেপোলিয়নের গণ্ডে এক প্রচণ্ড চপেটাঘাত করিলেন। খোকন পাড়া মাথায় করিয়া মনের সুখে চ্যাঁচাইতে লাগিল।

আমি একেবারে রাগিয়া আগুন। না বুঝিয়া না শুনিয়া এই আসুরিক মেজাজের অর্থ টা কী? মগের মুল্লুক পাইয়াছে নাকি? বেশ তো, আমার না-হয় ত্রুটিই হইয়াছে। কিন্তু পিতাপুত্রের মধ্যে বিসম্বাদের প্রসঙ্গটা কী, উহারই বা কী ইচ্ছা, আমারই বা কী বক্তব্য, এ-সকল না জানিবার পূর্ব্বে এই যে হিটলারীয় মেজাজে বেচারাকে পাঁচ আঙুলে রঞ্জিত করিল, ইহার প্রতিবিধান কী? লেখাপড়া তো সেদিনকার মতো মাথায় উঠিল। কিন্তু ইহার একটা বোঝাপড়া করিতেই হইবে। তিক্ত কণ্ঠে বলিলাম: "দ্যাখো, ইডিয়েটের মতো (ঐ ইংরাজি শব্দটি ক্রুদ্ধ হইলে আমি স্ত্রীর প্রতি প্রয়োগ করিয়া থাকি। উহাতে অপর পক্ষ অপমানে এত গর্জ্জাইতে থাকে যে দেখিয়া বড় আনন্দ হয়) কেবল মারলেই হয় না। মারছো তো আমারই ওপর রাগ ফলিয়ে? তুমি জানো, ও কী চায়? ও নেপোলিয়ন হ'তে চায়। তা-ও এই এক্ষুনি। এ আবদারের জবাব কী দেবে, শুনি?'

"তা নেপোলিয়ন হতে চায়, সে বায়না পূরিয়ে দিলেই হয়।"

বলিয়া দ্রুতবেগে কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া মুহূর্ত্তমধ্যে খোকনের গরম ওভারকোটটি হাতে করিয়া পুনরায় আবির্ভূত হইলেন। উপস্থিত সমস্যায় ওভারকোটের প্রাসঙ্গিকতাটা হঠাৎ ঠাহর হইল না। কৌতূহলী হইয়া উঠিলাম। দেখিলাম, ওভারকোটটি খোকনকে পরানো হইল।

বোতাম আঁটিয়া উহার দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুষ্ঠ ব্যতীত অন্য চারিটি আঙুল দ্বিতীয় ও তৃতীয় বোতামের মধ্যবর্তী ওভার-কোটের ফাঁকে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হইল, অঙ্গুষ্ঠটি কোটের উপর বিন্যস্ত হইয়া রহিল। অবশেষে অঞ্চলের সাহায্যে খোকনের চোখ-মুখ মুছাইয়া দিয়া তিনি কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন। খোকন তখন হাসিতেছে: 'বাবা, আমি নেপোলিয়ন হয়েছি।'

ব্যাপারটা বুঝিলাম। বুঝিতেই রাগ পড়িয়া গেল। গৃহিণীর উদ্দেশ্যে হাঁকিলাম: "আরে শোনো শোনো, শুনেই যাও না। এ খেলা কে আমদানি করলে?"

"ছোট্ ঠাকুরপো, আবার কে। খেয়ে দেয়ে তো আর কাজ নেই। কোন্ এক বই থেকে নেপোলিয়নের ছবি দেখিয়ে ওভারকোট চাপিয়ে ভাইপোকে রোজ নেপোলিয়ন সাজানো হয়। যত সব—"

বাকিটা কানে আসিল না।

বহুবচন

আপনার কথাবার্ত্তা আসে কেমন? আমার কিন্তু একদম আসে না। ধরুন, কোনো সভা-সমিতিতে বসিয়া পাশের ভদ্রলোকটির সঙ্গে-যে কী কথা বলিব, আমি ভাবিয়া পাই না। কেহ বাড়ীতে আসিলে দু'এক কথার পরই আমার ভাণ্ড নিঃশেষিত। হাজার মাথা ঝাঁকাইয়াও আর একটি বাক্য বাহির করিতে পারি না। আমি লক্ষ্য করিয়াছি, অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমি অপরের কথার জবাব দিই মাত্র, নিজে বুদ্ধি খরচ করিয়া কোনো প্রসঙ্গ তুলিয়া আলাপ জমাইতে পারি না। মহিলা হইলে তো কথাই নাই, ঠোঁট দু'টি তখন কে যেন সেলাই করিয়া দিয়াছে, হাঁ-টুকু পর্য্যন্ত অসম্ভব।

অথচ আমার স্বভাব মুখচোরা কিংবা লাজুক পর্য্যায়ের নয়। আমি পরিচিত মহলে প্রগল্ভ না হইলেও বাক্পটু, সেখানে দশ জনের মধ্যে আমি সহজেই অগ্রণী এবং কথার কৌশলে মোটামুটি দক্ষ। এ ছাড়া, আমার অন্য একটি দিকও আছে। যদিও পণ্ডিত নই, কোনো-কোনো বিষয়ে আমার চিন্তা আছে, কিছুটা মতামতও আছে এবং নিজের পরিচিত সেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কাহারো নিকট আমার কথা খুব অস্পষ্ট কিংবা অপ্রতুল নয়। লঘু ও গুরু আমাকে তেমন বিপন্ন করে না। কারণ, লঘু প্রসঙ্গে আমি পারদর্শী

এবং—বিশেষ গুরুতর না হইলে—গুরুগুরু আওয়াজেও খুব-একটা দুর্ব্বল বোধ করি না। অর্থাৎ লঘুগুরু জ্ঞান আমার কিছুটা আছে, যাহাতে নিতান্তই অকিঞ্চন তাহা হইল মধ্যটি, যে-মাধ্যমে সমাজ-সংসারে পরস্পরের মেলামেশা ও প্রীতিসংযোগ।

ইহা আমার গর্ব্বের বিষয় নয়, লজ্জার বিষয়। কথা হারাইয়া ফেলিয়া নির্ব্বাক বসিয়া থাকা কৃতিত্বের ব্যাপার নয়, বরং সামাজিকভাবে ইহা এক রকম অশিষ্টতা। কিন্তু, কী করিব, এ ব্যাপারটি যে আমার মোটেই আসে না, এবং যাহা আসে না তাহা গায়ের জোরে আনিবার চেষ্টা বৃথা। অথচ দুঃখের বিষয়, অনেকে ভাবেন, আমি অহঙ্কারী, কাহারো সঙ্গে কথাই বলি না। কেন-যে এই দেমাক তাহা লইয়াও গবেষণা প্রচুর।

সেদিন বাড়ীতে একটি ভদ্রলোক আসিয়াছিলেন। দেখিয়া তাঁহাকে চিনিলাম না। যথারীতি নমস্কার অন্তে অযথা হাঁ করিয়া থাকাতে তিনি বলিলেন, আমি সন্তোষ। আরে তাই তো, কী লজ্জা, আসুন আসুন, বলিয়া ক্ষিপ্রগতিতে দুইটি চেয়ার টানিয়া লইয়া ভদ্রলোককে বসাইলাম এবং ভিতরে চায়ের কথা বলিয়া দিলাম। কিন্তু হাতপায়ের ক্ষিপ্রতা রসনায় সংক্রামিত হইল না, যতখানি আয়োজন করিয়া নিয়া বসা গেল, আলাপ ততখানি অগ্রসর হইল না। প্রথমত, ইনি আমার অপরিচিত। মনে পড়িল, কবে একবার ইহার বাড়ীতে কী-একটা কাজে

গিয়াছিলাম, তাহার পর আর দেখাসাক্ষাৎ হয় নাই। সম্পর্ক একটা আছে বটে, কিন্তু সে-আত্মীয়তার সূত্র অতি সূক্ষ্ম, সচরাচর দৃষ্টির বহির্ভূত। বলিলাম, এদিকে এসেছিলেন বুঝি? তিনি বলিলেন, হ্যাঁ। বলিলাম, যা দূর! তিনি আবার বলিলেন, হ্যাঁ। বড় মুস্কিলে পড়িয়া গেলাম। ইনি আমার চাইতেও মিতভাষী, কথা আগাইয়া নেন না, থম্‌কাইয়া দেন। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া যদি-বা একটা কথা ফাঁপাইয়া তুলিবার চেষ্টা করি, তিনি এক আওয়াজের খোঁচায় তাহা চুপ্‌সাইয়া দেন। যখন চা আসিল তিনি বলিলেন, তিনি চা খান না। ধূমপানেও বৈরাগ্য। অর্থাৎ বলিবার পরিবর্ত্তে কিছু করিবারও উপায় নাই। মিনিট কুড়ি দু'জনে মুখোমুখি বসিয়া থাকিবার পর সভা ভঙ্গ হইল।

অবশ্য ইহা আমার আতিথেয়তার সচরাচরিক দৃষ্টান্ত নয়। সচরাচর যাহা ঘটে তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। আমার সঙ্গে যাঁহাদের কেবলমাত্র ভদ্রতার ক্ষণ-পরিচয় অথবা ক্ষীণ পরিচয়, তাঁহাদের কেহ বাড়ীতে আসিলে, আলাপের সূত্রপাত অপর পক্ষ হইতেই হয়, আমি কেবল দয়া করিয়া জবাব জোগাইয়া যাই। যেন আমি-ই তাঁহাদের পরম অতিথি, আপ্যায়নের দায় তাঁহাদের।

অনেকদিন ভাবিয়াছি, আমার এ অক্ষমতা কেন? কেন আমি আর দশজনের মতো কথা বানাইতে পারি না? পৃথিবীতে কি কথার অভাব? আপনি রহস্যচ্ছলে উপদেশ

দিয়া বলিতে পারেন, আর দশজনে কী কথা বলে শুনিয়াও তো বাপু শিখিতে পারো। সে-চেষ্টা কি করি নাই, মনে করেন? ধরুন, কোনো চা-পার্টিতে গিয়াছি। চতুর্দ্দিকে তাকাইয়া দেখি, ছোটো-ছোটো চা'য়ের টেবিল চতুর্ম্মুখে কথা বলিতেছে। নিজের চেয়ারটি ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলাম। এবং উৎকর্ণ হইয়া অন্যমনে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। এক টেবিলের পাশ দিয়া যাইতে যাইতে শুনি, ন্যাশানালাই-জেশনের আলোচনা হইতেছে। পাশের টেবিলে একজন বুঝাইতেছেন, ম্যালেরিয়া অঞ্চলে ধানের চাষ অতি ফলপ্রসূ। তৃতীয় টেবিলে চারটি মহিলা কী বলিতেছেন বুঝিলাম না, তাঁহারা সকলেই একযোগে কথা বলিতেছেন। আরেকটু আগাইয়া যাইতে কানে আসিল: 'পড়বেন বইখানা, ভারী চমৎকার।' কী বই ধরিতে পারিলাম না। যাঁহাদের উদ্দেশ্যে পুস্তকটির পরিচয় দেওয়া হইতেছে, তাঁহারা অতি উৎসাহে মাথা নাড়িতেছেন। দূরের একটি কোনের টেবিলে একজনের কাণ্ড দেখিয়া হাস্য সম্বরণ কঠিন হইল। তাঁহার কথা কানে আসিতেছে না, কিন্তু হস্ত-সঞ্চালন এবং হস্তের অঙ্গুলী-সঙ্কেত চোখে দেখিতেছি। সেই বাহুভঙ্গী ও মুদ্রার বৈচিত্র্য এত বিবিধ যে একটি সুসংবদ্ধ বক্তৃতায় তাহাদের প্রত্যেকটিকে ক্রমানুযায়ী অঙ্গীভূত করা মুস্কিল। হঠাৎ দক্ষিণ বাহু উর্দ্ধে উত্তোলিত হইয়া উহার তর্জ্জনী শূন্যে চক্রাকারে ঘুরিতে লাগিল, পরক্ষণই বাহুখানি নামিয়া আসিয়া দুই হাত একত্র হইল এবং

হাতের তেলো-য় তেল মাখিবার পদ্ধতিতে যুক্তহস্ত পরস্পরের গাত্রমার্জ্জনা করিতে লাগিল। আবার মুহূর্ত্ত-মধ্যে হাত বিচ্ছিন্ন হইল, এবং মৃদঙ্গে বোল ফুটাইবার ভঙ্গীতে দুই হাত শূন্যে পাখা ঝাপ্‌টাইতে লাগিল। কোনো বৈজ্ঞানিক্ প্রক্রিয়া বোঝানো হইতেছে মনে করিলাম। কাছে আসিয়া শুনি, জাতীয় সঙ্গীতের তর্ক হইতেছে।

ঘুরিয়া ঘুরিয়া কত কথাই শুনিলাম। কিন্তু এত বিচিত্র বহুবচন শুনিয়াও কোনো শিক্ষা পাইলাম না। যতগুলি বিষয়ের আলোচনা শুনিলাম, তাহার কোনোটিতে আমার উৎসাহ নাই, এবং আমি জানি, ইঁহাদের যে-কোনো দলের সঙ্গে বসিলে আমি চুপ করিয়াই থাকিতাম। একটি প্রশ্ন আপনি এখনই করিবেন। 'অন্যে যে-বিষয়ে কথা বলে, তাহাতে না-হয় তোমার উৎসাহ নাই, তুমি বাপু নিজের দু' একটি উৎসাহ-ই উহাদের শুনাইয়া দাও না কেন?' একেবারে গোড়ায় ঘা দিয়াছেন। কথাটি বোধহয় এখনই পরিষ্কার হইবে।

কথোপকথনের দুই স্রোতঃ জানা এবং জানানো। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য, এই দু'য়ের কোনোটিতেই আমি গা ভাসাইতে পারি না। আমার জ্ঞানস্পৃহা, দুঃখের বিষয়, খুব প্রবল নয়। প্রথমতঃ আমি সব কিছু জানিতে চাই না, দ্বিতীয়তঃ যাহা জানিতে চাই তাহা চায়ের টেবিলে কিংবা নিমন্ত্রণ সভায় নয়। সেখানে দুই দণ্ডের ভদ্রতা বিনিময়ের অবকাশে কিছুই জানা যায় না। জানাইবার

লোকটিও হয়তো সবজান্তা পর্য্যায়ের উর্দ্ধে নয়। আবার, সেই কারণেই আমার জানাইবারও প্রবৃত্তি নাই। স্থান-কালের প্রশ্ন তো আছেই, তাছাড়া আমি এমন-কী জানি যাহা অন্যেকে না জানাইলেই নয়? এই দ্বন্দ্ব আমার মনে সর্ব্বদা লাগিয়াই আছে, তাই ভদ্রতার আলাপে রসনার জড়তা কোনোকালে ঘুচিল না।

অপরের কথা শুনিবার চাইতে নিজের কথা বলিতে লোকে বেশি ভালোবাসে। এজন্য ভদ্রতার প্রথম প্রশ্নই কুশল জিজ্ঞাসা,—অপরকে আত্মপ্রচারের সুযোগ দেওয়া। এই সূত্র হইতে আমারই মতো বিপন্ন আমার জনৈক বন্ধু ভদ্র আলাপের একটি প্রথম পাঠ উদ্ভাবন করিয়াছেন। কথার অভাবে কথা বন্ধ হওয়া বড় অস্বস্তিকর ব্যাপার। কিন্তু আমার বন্ধু মন্মথবাবুর সে-বিপদ নাই। তিনি অবলীলাক্রমে ঘন্টার পর ঘণ্টা নানা প্রশ্নে এবং নানা জিজ্ঞাসায় যে-কোনো ব্যক্তিকে আপ্যায়িত রাখিতে পারেন। কোনো তথ্য তাঁহার নিকট তুচ্ছ নয়, কোনো সংবাদে তাঁহার ক্লান্তি নাই, যখন যাহাকে পাইতেছেন, তাঁহাকেই আঁকড়াইয়া ধরিয়া যতক্ষণ খুসি পড়িয়া আছেন। সেদিন এক অপরিচিত আগন্তুকের সহিত মন্মথবাবু আলাপ করিতেছিলেন। মন্মথবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন:

'আপনাদের গ্রেড পাঁচশো অবধি বল্লেন না?'

'হ্যাঁ, পাঁচশো অবধি'

'তা মন্দ কি! প্রফেসারি করলে তো দু'শোর বেশি ভাবতেই পারতেন না। ক'দিন হ'লো আপনার চাকরি?'

'তা হ'লো বৈ কি। পনেরো বছর আছি'

'রিটায়ারমেণ্ট তো পঞ্চান্নতেই!'

'কাগজে কলমে তাই, তবে ষাট বছর অবধি চলে'

'বাঃ ভারী চমৎকার তো। কোয়ার্টার্সও পান নিশ্চয়ই?'

'হ্যাঁ কোম্পানি থেকেই দেয়'

'টেন্ পার্সেণ্ট!

'হ্যাঁ টেন্ পার্সেণ্ট। বেশ বড় কম্পাউণ্ডওলা বাড়ী। সবারই তাই।"

'সুখে আছেন বলুন। বাড়ীতে গাছটাছ আছে?'

'গাছ? তা আছে কিছু-কিছু।'

'কী-কী গাছ আছে?'

'কী কী গাছ আছে?—তা ধরুন, আম আছে, কাঁঠাল আছে—'

'কাঁঠাল? কাঁঠাল ওদিকে হয়? বাড়ে না নিশ্চয়ই, এঁচোড় খান?'

'না, একেবারে যে বাড়ে না, তা নয়, তবে—'

'যাক গে। আর কী কী গাছ আছে বলুন'

'আর আছে নিমগাছ, আমলকী, দেবদারু—আরো নানারকম, নাম বলতে পারবো না।'

'পাখী টাখী বসে?'

'কোথায়?'

'কেন, গাছে? আপনার বাড়ীর গাছে?'

'তা বসে বৈ কি'

'কী কী পাখী বসে?'

'কেন, কাক চড়াই শালিক—'

'কাক—চড়াই—শালিক। কাক বেশি বসে, না চড়াই বেশি বসে?'

'কাক।'

'দাঁড়কাক?'

'না দাঁড়কাক নয়, ছোটো কাক।'

'ছোটোকাক মানে পাতিকাক?'

'তা যা-ই বলুন।'

'আচ্ছা, ওদিকে কত কাক হবে?'

'তা কী করে, বলবো? গুনে তো আর দেখি নি।'

'আচ্ছা শালিক'? শালিক গুনেছেন?'

মন্মথবাবুর জ্ঞান পিপাসা অসীম, জিজ্ঞাসারও অন্ত নাই। কথোপকথনের যে-নমুনা দেখিতেছেন, অবশ্যই স্বীকার করিবেন ইহা দুই তিন দিন অবাধে চলিতে পারে, যদি-না অপর পক্ষ অর্দ্ধঘণ্টা না হইতেই উঠিয়া যান।

দুই অধ্যায়

এক

হাত-ঘড়িটা হঠাৎ বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। পঞ্চাশ মিনিটের ক্লাশ, ২-২০ হইতে আরম্ভ হইয়া ৩-১০ মিনিটে ঘণ্টা পড়িবার কথা। অর্দ্ধ ঘণ্টার উপর বিস্ফারিত কণ্ঠে বক্তৃতা দিবার পর লক্ষ্য করিলাম, ঘড়িতে সবে আড়াইটা বাজিয়াছে। কী সর্ব্বনাশ! আরো চল্লিশ মিনিট? পুনরায় হু হু বেগে ইঞ্জিন চালাইলাম। ইংরাজী শব্দগুলি মুখ-গহ্বর হইতে একেবারে বে-পরোয়া উৎক্ষিপ্ত হইতে লাগিল। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই বাহিরে ঘণ্টা ধ্বনি হইল। ব্রেক্ করিয়া শেড্ অভিমুখে যাইতে যাইতে উপলব্ধি করিলাম, ঘড়িটা বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

শ্বাস-প্রশ্বাস ফিরাইয়া আনিবার যতগুলি প্রাথমিক শুশ্রূষার কৌশল জানা ছিল, একে একে সবগুলি প্রয়োগ করিলাম। কিন্তু ফল হইল না। ঘড়ির কাঁটা দুইটা-তেত্রিশ মিনিটে স্থির হইয়াই রহিল। শেষকালে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। ঘড়িটাকে মুঠার মধ্যে লইয়া এক প্রচণ্ড ঝাঁকুনি লাগাইলাম। এই প্রক্রিয়ার ফলে মাত্র মুহূর্ত্তের জন্য ঘটিকাযন্ত্রে জ্ঞানসঞ্চার হইল,—সেকেণ্ডের কাঁটাটি ক্ষণেকের জন্য টিক্‌টিক্ করিয়া আবার স্তব্ধ হইয়া গেল।

পর দিবস ঘড়িটি মেরামতের জন্য দোকানে পাঠাইলাম। ভাগিনেয় ফিরিয়া আসিয়া জানাইল উহার স্প্রিং কাটিয়া

গিয়াছে, খরচ বারো টাকা লাগিবে। বলিলাম মেরামত করিয়া কাজ নাই, উহা আমার টেবিলের উপর রাখিয়া দাও। বৈকালের দিক নিজেই ঘড়িটি লইয়া এক পরিচিত দোকানে গিয়া উপস্থিত হইলাম। কারিগর ঠুলি পরিয়া বহুক্ষণ ঘড়িটির কলকব্জা পরীক্ষা করিয়া জানাইল, কোথায় নাকি কী-একটা সূক্ষ্ম দণ্ড ভাঙিয়া গিয়াছে, মেরামত করিতে ষোলো টাকা পড়িবে। উত্তেজনা প্রকাশ না করিয়া শান্তভাবে ঘড়িটি কব্জিতে বাঁধিয়া দোকান হইতে পথে বাহির হইয়া পড়িলাম।

বাড়ীতে ফিরিয়া ঘড়িটি হাত হইতে খুলিতে গিয়া দেখি, টিক্‌টিক্ করিয়া উহা দিব্য চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। চোখের ভুল নয় তো? কানে লাগাইতে আর সন্দেহ রহিল না। ঘড়ি সত্যই চলিতেছে। সন্তর্পণে টেবিলের উপর রাখিয়া দিলাম। তখনো চলিতেছে। অর্দ্ধ ঘণ্টা পর দেখিলাম,—তখনো থামে নাই। বেশি আর বলিব কি, তদবধি চলিতেছে-ই, আজ পর্য্যন্ত আর থামিল-ই না।

দুই

ঘড়ি-বিভ্রাট ভাগ্যক্রমে কাটিল বটে। কিন্তু ইহার কিছু দিনের মধ্যে আরেক বিপাকে পড়িয়া গেলাম। বৈকালে স্নান করিয়া বাথ-রুম হইতে বাহির হইয়া মনে হইল, দক্ষিণ কর্ণে কী-রকম একটা মৃদু গুঞ্জনধ্বনি শ্রুত হইতেছে। স্ত্রী রহস্য করিয়া বলিলেন: ও কিছু নয়, এতদিনে কানে জল গিয়াছে আর কি। কিন্তু কালক্রমে

গুঞ্জনের মাত্রা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। প্রথমে দক্ষিণ কর্ণ, পরে উভয় কর্ণ। অসংখ্য ঝিঁ ঝিঁ পোকা যেন কান দুইটিতে বাসা বাঁধিয়াছে। রাত্রিদিন উহাদের ঝঙ্কার-ঝঞ্চনার আর বিরাম নাই। শঙ্কিত হইয়া উঠিলাম। অবশেষে বন্ধুবান্ধবের পরামর্শে ছুটি লইয়া কলিকাতায় দৌড়াইলাম এবং বত্রিশ টাকা ফি দিয়া এক সেরা বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হইলাম। ডাক্তার প্রথমেই প্রশ্ন করিলেন ঃ

"সপ্তাহে ক'বার হাঁচি দেন ?

"নস্যি নিলে—

"না না, নস্যি নয়। নস্যি ছাড়া ক'বার, বলুন।"

"নস্যি ছাড়া আমার হাঁচি আসে না।"

ডাক্তার যেন এই উত্তরটারই প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি পরম পুলকিত হইলেন। অতঃপর নাসিকা, গলা এবং সর্ব্বশেষে কর্ণদ্বয় পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, আপনার হাঁপানি হইয়াছে, কানের হাঁপানি। সারিয়া যাইবে, ভয় নাই। ইন্‌জেকশন, ঔষধ, পেইন্ট্ ইত্যাদি বহুবিধ ব্যবস্থাপত্র লইয়া বাসায় ফিরিলাম।

রাত্রে শুইয়া-শুইয়া ভাবিলাম, কলিকাতায় যখন আসিলাম-ই, তখন আরো দু'একজনকে দেখাইতে দোষ কি ? কানের হাঁপানিটা তো আর চাট্টিখানি কথা নয়। ভাবিয়া চিন্তিয়া পরদিবস অন্য এক স্পেশ্যালিস্টের গৃহে উপস্থিত হইলাম। আবার বত্রিশ টাকা। ইনি কিন্তু তেমন কিছু প্রশ্নাদি করিলেন না। কেবল জিজ্ঞাসা করিলেন, কী

করেন? সভয়ে বলিলাম, মাষ্টারি। তারপর পরীক্ষা সুরু হইল। ইঁহার যন্ত্রাদির সংখ্যা গতকল্যকার বিশেষজ্ঞের অপেক্ষা অনেক বেশি। পরীক্ষার প্রণালীও অভিনব। একটা চিমটা দ্বারা নাসারন্ধ্রদ্বয়কে বিস্ফারিত করিয়াই রাখিলেন প্রায় দশ মিনিট।

সে-রাত্রে কলিকাতায় জাপানী বোমা পড়িল। উহাই প্রথম। একাদিক্রমে উপর্য্যুপরি তিন দিন। পঞ্চম দিবস রাত্রে স্বস্থানে ফিরিবার উদ্দেশ্যে শিয়ালদহ স্টেশনে আসিতেই আবার সাইরেন! নিমেষে সমস্ত স্টেশন অন্ধকারে লুপ্ত হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার, ঠেলাঠেলি, দৌড়াদৌড়ি—সে এক বীভৎস ব্যাপার। কুলিগণ শিরোধৃত মাল মাটিতে ফেলিয়া দিয়া পলায়ন করিতেছে। মাথার উপর হঠাৎ কী একটা আসিয়া পড়িল। মনে হইল, জগদ্দল পাথর চাপা পড়িলাম। মাথাটা যেন গলা হইতে ছিঁড়িয়া গেল। কাৎরাইতে কাৎরাইতে হাতড়াইতে হাতড়াইতে কোনো প্রকারে শেল্‌টারে আসিয়া কাঁপিতে লাগিলাম। ধীরে ধীরে চতুর্দ্দিকের কোলাহল মিলাইয়া আসিল,—তারপর সমস্ত স্টেশন ব্যাপিয়া সে এক অদ্ভুত অবর্ণনীয় স্তব্ধতা। সেই স্তব্ধ অন্ধকারে হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দন শুনিতে শুনিতে হঠাৎ আবিষ্কার করিলাম, কানের শব্দ থামিয়াছে। একেবারেই থামিয়াছে। বেশি আর বলিব কি, সেই যে থামিল আজ পর্য্যন্ত তাহার আর পুনরাবৃত্তি হয় নাই।

ভগবান

টাইফয়েডের উপর ডবল নিউমোনিয়া! যমে-ডাক্তারে টানাটানি। দশ বৎসরের বালক, শক্তিই বা কতটুকু, তবু যুঝিতেছে। অভাব-অনটনের সংসার, আয় সামান্য। এমনিতেই তো লড়াই লাগিয়া আছে। তিরিশটা দিন যেন তিরিশটা ঝোড়ো নদীর ঢেউ; মাস চালানো অর্থ ওই ঢেউগুলির মাথায়-মাথায় পড়ি-মরি করিতে করিতে ঝোড়ো নদী পার হওয়া। পারাপারের ডোঙা হইল জীর্ণ একখানি কাগজ খণ্ড, ব্যাঙ্কে পাঠাইলে উহাতে জাহাজ মেলে না। যাহা পাওয়া যায়, তাহাতে কোনো মাসে মাঝ দরিয়ায় নৌকাডুবি, কোনো মাসে বা রওনা হইতে না হইতেই বানচাল! অর্থাৎ হাবুডুবু লাগিয়াই আছে, নাকানি-চুবানি নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার।

ছেলের অসুখ আরম্ভ হইবার পর হইতে এখন এক-রকম তলাইয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। কী যে অবস্থা, বলিবার নয়। ডাক্তারগণ অম্লানবদনে টাকা শুষিতেছে। ইহা তো না হয় জানা কথা। তদুপরি ছোট বাড়ীতে অসম্ভব স্থানাভাব। একটি ছেলে সহ স্বামি-স্ত্রীতে দুখানা কামরায় কুলাইয়া যাইত। ইদানীং অসুখের খবর পাইয়া ভ্রাতাগণ আসিয়াছেন, দেশের গ্রাম হইতে মা আসিয়াছেন, দুই

ভগিনী এই শহরেই থাকেন, স্বামিগণসহ তাঁহারাও এ বাড়ীতে মোতায়েন। এতগুলি প্রাণীর খাদ্য-সংস্থান র‍্যাশনের যুগে আরেক সমস্যা। অনিল বিভ্রান্ত, বিপর্য্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে।

স্বামি-স্ত্রীতে কথাবার্ত্তা হইতেছিল। স্ত্রী সরমার চক্ষু বাষ্পাকুল, রোগের তৃতীয় সপ্তাহে খোকনের বিকার লক্ষণ দেখা দিয়েছে, অসংলগ্ন কথা বলিতেছে, মা'কে পর্য্যন্ত চিনিতে পারে না। আজ ডাক্তারদের ধরন-ধারণেও বিশেষ ভরসার ইঙ্গিত নাই। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে সরমা বলিল :

"বাবা তো এলেন না।"

"বাবা এসে আর করবেন কি? অবস্থা কি আর উনি বোঝেন নি? আসছেন না ইচ্ছে করেই।"

"তবু একবার এলে পরামর্শ হতে পারতো। চিকিৎসা যদি বদলাতে হয়। কে এক সাধু নাকি আছেন—"

"সাধু!—"

অনিলের সাধু-সন্ন্যাসীর উপর কোনো কালেই ভক্তি নাই। অন্য সময় হইলে শুনিবামাত্র চটিয়া উঠিত। বর্ত্তমান সঙ্কটে মনের আকাঙ্খা ও অবিশ্বাসে মিলিয়া মুখমণ্ডলে হতাশের হাসি ফুটিয়া উঠিল। কেবল মাত্র বলিল :

"সাধু! সাধুর ঝাড়ফুঁকই বাকি আছে।"

সরমা নীরবে আঁচলে চোখ মুছিল।

বৈকালে বিনা সংবাদে অনিলের বাবা আসিয়া

পৌঁছিলেন। বয়স ষাঠের কাছাকাছি, অথচ বেশ শান্ত ও সুস্থ চেহারা। দেশে থাকেন এবং দেশে থাকিতেই ভালোবাসেন। মুখখানি চিন্তাক্লিষ্ট, ইহা ব্যতীত দেহে জরাব্যাধির চিহ্ন নাই। এখনো-যে বাংলা দেশের গ্রামে স্বচ্ছন্দে জীবনযাপন করা সম্ভব তারক বাবুকে দেখিলে তাহা বোঝা যায়। পৌঁছিবামাত্র ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন :

"কেমন আছে খোকন ?"

নীরব অভ্যর্থনায় পুত্রকন্যাগণ পদধূলি লইল। তারক বাবু দৌড়াইয়া গিয়া পৌত্রের শিয়রে উপবেশন করিলেন।

"ভয় নেই, কিছু ভয় নেই, ভগবান আছেন ভয় কি ? ভগবানকে সকলে ডাকো, খোকন ভাল হয়ে উঠবে।"

কথাটা মামুলি। কিন্তু কি জানি কেন, তারকবাবুর কণ্ঠে অপূর্ব্ব শোনাইল। এমন করিয়া যেন কেহ কোনোদিন ভগবানের উপর ভরসা করিবার পরামর্শ দেয় নাই। এতখানি নির্ভরও যেন কেহ কোনোদিন করে নাই। হঠাৎ বদ্ধ বাতাস কাটিয়া গিয়া সকলের মনের ভিতর নূতন হাওয়া লাগিল।

সরমা শ্বশুরের জন্য মহা ব্যস্ত। তাঁহার বিশ্রামের জায়গা কোথায় একটু করিয়া দেওয়া যায়। বাড়ীতে তো তিল ধারণের স্থান নাই। অন্যদের দিবারাত্রি যে ধকল সহ্য হইতেছে, উঁহার তা সহিবে কেন ? তাছাড়া নিরালায় বসিয়া একটু জপতপ সন্ধ্যা আহ্নিকও তো আছে। তারকবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন :

"নিরিবিলি একখানা ঘর পাওয়া যাবে, বৌমা? আমি আজ সমস্ত রাত ভগবানকে ডাকবো। একটু ফুল চন্দনের আয়োজনও করে দিতে হবে।"

দ্রুত পরামর্শে স্থির হইল, কন্যা অরুণার বাড়ীতে ব্যবস্থা হইবে। অরুণা আয়োজন করিতে তাড়াতাড়ি বাড়ী চলিয়া গেল। তারকবাবু আবার আসিয়া পৌত্রের শিয়রে বসিলেন।

সরমা বিশ্বাসে বুক বাঁধিল। শ্বশুর বলিয়াছেন, আমি আজ সমস্ত রাত ভগবানকে ডাকবো, দেখো, কাল ঠিক জ্বর নেমে যাবে। শ্বশুর শুদ্ধচিত্ত সাত্বিক পুরুষ, সন্ধ্যা আহ্নিক, পূজা-অর্চনা ইত্যাদি পূণ্যাচার অত্যন্ত নিয়ম ও নিষ্ঠার সহিত চিরকাল করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাকে দেখিলে ভক্তি হয়, মনে হয়, ভগবানের দাক্ষিণ্য ইঁহার মতো ব্যক্তিরাই পৃথিবীতে ডাকিয়া আনিতে পারেন।

সন্ধ্যার পর তারকবাবু কন্যার বাড়ীতে চলিয়া গেলেন। অরুণা কাজের মেয়ে। সে একখানি ঘর অতি নিপুণহস্তে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া দিয়া আসিয়াছে। অন্যান্য আয়োজনও প্রস্তুত।

এদিকে খোকনের সন্ধ্যা হইতে জ্বর বাড়িয়াছে। রাত্রির অন্ধকারে দুশ্চিন্তা আরো ঘনাইয়া আসে। থম্থমে ভাবটা সকলের মুখমণ্ডল ঘেরিয়া ক্রমশঃ ঘোরতর হইয়া উঠিতেছে। সরমা নির্নিমেষ নেত্রে খোকনের মুখের দিকে তাকাইয়া বসিয়া আছে। তাহার কিন্তু আজ আর ভয় নাই। কাল জ্বর ছাড়িয়া যাইবে, এ তাহার দৃঢ় বিশ্বাস।

খোকনের শীর্ণ হাতখানি হাতে লইয়া নিস্পন্দ ভাবে বসিয়া আছে।

রাত্রি বারোটার পর যেন অবস্থা আরো খারাপ হইতে লাগিল। ডাক্তার না ডাকিয়া আর পারা গেল না। ডাক্তারদের পরামর্শ শুনিয়া সরমা বড় চঞ্চল হইয়া উঠিল। সে কি, ইন্‌জেক্‌শন্‌ দেওয়া হইবে নাকি? না, না, তাহা সে কিছুতেই দিতে দিবে না। আজ রাত্রিটা অন্ততঃ খোকনকে ডাক্তারদের হাত হইতে রক্ষা করিতে হইবে। আজ যে ভগবানকে ডাকা হইতেছে।

হঠাৎ এক সময়ে সরমা নিঃশব্দে ঘর হইতে চকিতে বাহির হইয়া গেল।

নিস্তব্ধ রাতে শহরের অন্ধকার রাস্তা বাহিয়া সরমা দ্রুত হাঁটিয়া চলিয়াছে। ডাক্তারদের একজন ইন্‌জেক্‌শন্‌ আনিতে গিয়াছেন, তিনি ফিরিবার পূর্ব্বে বাবার কাছে পৌঁছিতে হইবে। রাস্তায় লোকজন নাই, সরমা একা হাঁটিয়া চলিয়াছে।

অরুণার বাড়ীর একটি ঘরে মিটমিট করিয়া আলো জ্বলিতেছে। বাবা তাহলে ঐ ঘরে। বহিরঙ্গনে ঢুকিতে ছোটো একখানা গেট খুলিতে হয়। পাছে বা শব্দ হয়, সরমা অতি সন্তর্পনে গেট খুলিয়া প্রবেশ করিল। বাবাকে কি প্রার্থনা হইতে জাগাইবে? না, সে তাহা করিবে না। সে আজ ঐ ঘরের সম্মুখে বসিয়া রাত কাটাইবে। ডাক্তারদের ব্যভিচার সে অন্ততঃ চোখে দেখিবে না।

একটি জানালা ঈষৎ উন্মুক্ত। একটি দীর্ঘ ম্লান আলোর রেখা ঐ গবাক্ষ পথে স্থির হইয়া আছে। সরমা অতি ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হইয়া আসিল। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে জানালার ফাঁক দিয়া ভিতরে দৃষ্টিপাত করিল।

দেখিল, তারকবাবু একখানি বালিশ মাথায় দিয়া অকাতরে নাক ডাকাইতেছেন।

তাল এবং মিছিল

সেদিন এক নিমন্ত্রণ সভায় একটি ভদ্রলোক বলিতেছিলেন, তাঁহার ভয়ানক বদ অভ্যাস, উচিত কথাটি স্পষ্ট ভাষায় শুনাইয়া দেওয়া। এ বিষয়ে তিনি কাহাকেও পরোয়া করেন না, তা তিনি যত উচ্চপদস্থ লোকই হন না কেন। এই তো সেদিন কালেক্টার সাহেবকে ধরিয়া দুই কথা আচ্ছা করিয়া শুনাইয়া দিয়া আসিলেন। "বলিলাম, সাহেব, আমাদের দেশের আসল খবর তো আর কিছু রাখো না। দু দিনের জন্য আসিয়া ফপরদালালি করিয়া চলিয়া যাও। এদিকে—"

একটি দুষ্টবুদ্ধি যুবক প্রশ্ন করিয়া বসিল, ফপরদালালির ইংরিজীটা কি বলিয়াছিলেন? স্পষ্টবক্তার নিতান্ত মন্দ ভাগ্য। সভাসুদ্ধ লোক হাসিয়া এমন উঠিল যে, স্পষ্টবক্তার সমস্ত কথা বেমালুম অস্পষ্ট হইয়া গেল।

যুবকটি আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। সে সভাসুদ্ধ সমস্ত লোককে এক বিষম বিপত্তি হইতে বাঁচাইয়া দিল। বিপত্তি বই কি। যাঁহারা নিজেদের গুণপনা সম্বন্ধে বড় বেশি স্পষ্ট আলাপ করেন, তাঁহারা সভ্য-সমাজের আতঙ্ক। দেখা হইলে গা ছমছম করে। ইঁহারা যে-সকল কীর্তি ধরাধামে রাখিয়া যাইতেছেন, সেগুলি দৈবক্রমে অপরের অজ্ঞাত। তাই যেখানে-সেখানে, সুবিধা পাইলেই, জাঁক করিয়া শুনাইতে

হয়, নতুবা লোকে জানিবে কি করিয়া? অথচ লোকে যে জানে না, তাহার কারণ কীর্ত্তিটা একেবারে কাল্পনিক না হইলেও বলিবার মতো কিছু নয়। বহ্বাস্ফোট-পরায়ণ ব্যক্তি মাত্রেরই ওই এক অভ্যাস। যাহা করেন, তাহা একেবারে ফলাও করিয়া জাহির করা চাই, যেন এ কর্ম্মটি পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্য্যের অন্যতম।

জাহির করিবার ধরনটি সাধারণত দুই রকমের হইয়া থাকে। কেহ কেহ তিলকে তাল করিয়া জাহির করেন। অনেকে আবার আসল ব্যাপারটিকে তেমন না বাড়াইয়া এমন আড়ম্বর ও সমারোহে উহা ঘোষণা করেন যে, হঠাৎ ভ্রম হয়, সামান্য ব্যাপারটি বুঝি আসলে অসামান্য। প্রথমটি হইল অতিরঞ্জনের কৌশল। ইহার সুবিধা এই যে, বলিবার সময় ঢাক-ঢোল বাজাইবার দরকার হয় না। তিলটি তো প্রথমেই তালে পরিণত হইয়াছে। এখন শুধু সভায় সভায় তালপত্র বিতরণ করিয়া গেলেই কার্য্যশেষ। দ্বিতীয় প্রণালীটি অনেকটা বিবাহের মিছিলের মত। একটা রীতিমত তাণ্ডব সম্মুখে লইয়া জরিমখমল-পরিহিত নাতিসুশ্রী যুবকটি দশাশ্বচালিত স্যন্দনে বিবাহ করিতে চলিয়াছে। কেবল বরটিকে দেখিলে হয়তো নাক সিঁটকাইতেন। কিন্তু সমারোহে হকচকাইয়া গিয়া উহার আসল রূপটি দৃষ্টি এড়াইয়া গেল।

আমার দুর্ভাগ্য, আমাকে এই দুই জাতীয় বিপাকেই পড়িতে হইয়াছে। অতিরঞ্জন-কৌশলী রঞ্জনবাবুর কথাই

প্রথমে বলি। তিনি ঘরে ঢুকিবামাত্র ঘ্রাণেই যেন টের পাই, আলোয়ানের তলায় একটি অতি পরিপক্ক তাল ঢালিয়া ঢুকিয়া সঙ্গে আনিয়াছেন। তাল সামলাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকি। প্রথমটায় এটা সেটা নানারকম ছোটোখাটো বিষয়ের আলোচনা চলিতে থাকে। উহা গ্রাউণ্ড প্রিপারেশন। অর্থাৎ আলাপটা উচ্চগ্রামে না চড়াইয়া নীচু পর্দ্দায় বাঁধিয়া রাখিবার আয়োজন। ইহার সার্থকতা অনভিজ্ঞের নিকট প্রথমে ধরা পড়ে না। আমারও প্রথম-প্রথম পড়ে নাই। উদ্দেশ্যটা পরে বুঝিয়াছি। আসল কথাটি পাড়িবার সময় আলাপের সুরটা যদি পূর্ব্বাপর একই রাখিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সুরের সহিত 'তাল'এর বৈষম্যটা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে এবং তালটি যেন হঠাৎ গাছ হইতে কাটিয়া গিয়া দুম্ করিয়া পিঠের ওপর পড়ে। আপনি মনে মনে একেবারে লাফাইয়া উঠেন। ওই মানসিক উল্লম্ফনটাই রঞ্জনবাবুর এবং তাঁহার গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য। রঞ্জনবাবুর ব্যবসা ডাক্তারি। পসারও মন্দ নয়। সেদিন নানা কথার ফাঁকে হঠাৎ বলিলেন, সাহেবগুলির ইংরিজি বোঝা যায় না কেন, বলুন তো? আমি বলিলাম, কোন্ সাহেবের সঙ্গে আবার দেখা করতে গিয়েছিলেন?

না, দেখা নয়। টেলিফোনে কথা হচ্ছিল।

কা'র সঙ্গে?

পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে।

পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে? কেন?

রঞ্জনবাবুর স্বুর অতি সহজ ও স্বাভাবিক। বলিলেন, না, বিশেষ কিছু নয়। আমার বাড়ীর সামনে একটা ট্রাফিক পুলিশের বন্দোবস্ত-র জন্যে। যা রুগীর ভিড় হয়।

তালটিকে আলোয়ানের বাহিরে আনিয়া ছাড়িয়া দিয়াই পর-মুহূর্ত্তে অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। ইহাই নিয়ম। ভাবখানা হইল, এমন একটা কী কথা বলিলাম, যাহার জন্য আমার কিংবা আপনার থমকাইয়া থাকিতে হইবে!

দূরের চাইতে নিকটের জিনিস যেমন বড় দেখায়, ইঁহাদের চোখেও তেমনই অন্যের তুলনায় নিজের গুণগুলি বৃহৎ বলিয়া বোধ হয়। নিজের তিলটিকে তাল বলিয়া মনে হয়, অপরের তালটিকে তিল বলিয়া বোধ হয়। মনশ্চক্ষুর এ রোগের চিকিৎসা নাই। উহাতে চশমা পরানো চলে না। ফলে রোগ বাড়িয়াই চলে।

রঞ্জনবাবুর জুড়ি হইলেন নবনীবাবু। ইনি এম, এ, পি-এইচ, ডি, (লণ্ডন)। মস্ত পণ্ডিত। ইস্কুল হইতে ইউনিভার্সিটি পর্য্যন্ত বরাবর প্রথম হইয়া আসিয়াছেন। কৃতী অধ্যাপক, বক্তৃতায় পারদর্শী, যুক্তিতর্কে অদ্বিতীয়। যে পুস্তকগুলি লিখিয়াছেন, তাহা দেশে বিদেশে সর্ব্বত্র উচ্চপ্রশংসিত। কিন্তু হইলে কি হইবে? ওই মনশ্চক্ষুর ব্যারামে একেবারে সব মাটি! একদিন তাস খেলিতে খেলিতে বলিয়া বসিলেন, জহরলাল নেহরু নিশ্চয়ই আমার উপর রাগ করিয়াছেন। আমরা স্তম্ভিত। বলিলাম কেন?

আমার পুস্তকের একখানি কপি তাঁহাকে এ যাবৎ পাঠাইতে পারিলাম না।—বলিয়াই নির্লিপ্তভাবে খেলায় মনোনিবেশ করিলেন।

কোনোকালে পণ্ডিত জহরলাল নেহরুর সহিত ইঁহার সাক্ষাতের সুযোগ হইয়াছিল। উহাই অতিরঞ্জিত হইয়া ঘনিষ্ঠ পরিচয়ে, এমন কি মান-অভিমানের সম্ভাবনায়, পরিণত হইয়াছে।

এখন মিছিলওয়ালাদের সম্বন্ধে কিছু বলা যাইতে পারে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, ইঁহাদের কৌশল হইল সমারোহ। পথের ধারে বাজিকরদের খেলা নিশ্চয়ই দেখিয়াছেন। সম্মুখে একটি কড়ি কিংবা পুতুল রাখিয়া খুব কষিয়া ডুগডুগি বাজাইতে থাকে। লোকের ভিড় জমিয়া যায়। সমারোহ দেখিয়া মনে হয় উহা সামান্য কড়ি কিংবা পুতুল নয়, আর কিছু। হয়তো এখনই নড়িয়া উঠিবে। আমাদের মিছিলওয়ালারাও ওই বাজিকরদের মতো তাঁহাদের ক্ষুদ্র কীর্ত্তিখানি সম্মুখে রাখিয়া উহাকে জাঁকাইয়া তুলিবার জন্য খুব খানিকটা হাত পা ছুঁড়িতে থাকেন। তাঁহারা নিজেদের কীর্ত্তিতে নিজেরাই মুগ্ধ, তাঁহারা বিশ্বাস করেন, উহা পাঁচজনকে ডাকিয়া চীৎকার করিয়া শোনাইবার মত। নিমন্ত্রণ-বাড়ীর যে স্পষ্টবক্তাটির কথা বলিতেছিলাম, তিনিও এই দলের। কালেক্টার সাহেবকে তিনি যাহা "শুনাইয়া" দিয়া আসিয়াছেন, তাহা নিতান্তই সাধারণ কথা। বিদেশী লোক দুই দিন থাকিয়া এ দেশের

কিছুই বুঝিতে পারে না, এই মাত্র। কিন্তু একে সাহেব, তাহার উপর একটা গোটা জেলার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা, তাহারও উপর এমনই এক প্রসঙ্গ যাহা চাকুরির দরবারও নয়, খেতাবের প্রার্থনাও নয়। সুতরাং এ এক মহা কীর্ত্তি। ইহাদের বাড়াইয়া বলিবার দরকার হয় না। কোনোদিন তাহা বলেনও না। সত্য সত্য যাহা করেন তাহাই যে এক রাজসূয় কীর্ত্তি।

মাত্রাজ্ঞানের ত্রুটিটি লক্ষ্য করিতেছেন নিশ্চয়ই। যে প্রশ্রয় এবং বাহবা আমরা ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের বাহাদুরি দেখিয়া দিয়া থাকি, ইঁহারা নিজেরাই নিজেদের সেই বাহবা দেন। .সাবাস বটে! এত বড় সাহসের কথাটা তুমি কি করিয়া সাহেবকে বলিয়া আসিলে?—স্বগতোক্তিটা যেন কানে স্পষ্ট শোনা যায়।

আপনাকে যদি ঘণ্টাখানেক কাটাইতেই হয়, তাহা হইলে আপনি ইঁহাদের কোন দলে ভিড়িবেন? আমি বিনা দ্বিধায় মিছিলওয়ালাদের দলে ভিড়িব। দুই দলই অসহ্য। কিন্তু তবু যেটুকু তারতম্য আছে, তাহা বোধ করি ইঁহাদের অনুকূলে। ইঁহারা মানসিকভাবে অপর পক্ষ হইতে অপেক্ষাকৃত সুস্থ এবং ভদ্র। নিজেদের তথাকথিত গৌরব লইয়া যে জগঝম্পটা বাজান, তাহা কুরুচিপূর্ণ ও মাত্রাবিরুদ্ধ হইলেও অপরের প্রতি তাহা অসম্মানজনক নয়। অনেকে ঘটা করিয়া পুত্রকন্যার জন্মোৎসব করেন। অপত্যলাভ এমন সাধারণ ব্যাপার যে ঘটা দেখিয়া অসহ্য বোধ হইতে পারে।

কিন্তু ওই পর্য্যন্তই। এ সমারোহ তাঁহাদের নিজেদের আনন্দের জন্য। অপরের দারিদ্র্য কিংবা অপুত্রক অবস্থার প্রতি কটাক্ষ করিয়া নয়।

রঞ্জন-নবনী-সম্প্রদায় সম্বন্ধে এ কথা বলা চলে না। অন্যের প্রতি তাঁহাদের অনতিগোপন মনোভাবটি অসম্মান-জনক। তাঁহারা মনে মনে অপরের মাথার উপর সর্ব্বক্ষণ পা তুলিয়া দিয়া বসিয়া আছেন। দয়া করিয়া কিংবা দায়ে ঠেকিয়া আজ আপনার সহিত আড্ডা দিতেছেন বটে, কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী যদি কাল প্রসন্ন হন, তাহা হইলে তাঁহার পেচকপক্ষীর পাখায় ভর করিয়া উন্নতির কোন্ অভ্রভেদী শিখরে তিনি উড়িয়া গিয়া বসিবেন, তাহা কি আপনি জানেন না? আগামী কল্যের এই সম্ভাবনায় তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ এত মশগুল যে, দুই দণ্ড বসিয়াই হাঁপ ধরিয়া উঠে।